লেখক পরিচিতি

লেখকের নাম ঃ হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। আক্বিদা বিশ্বাশে সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরী। পিতার নাম ঃ মুন্সী আদম আলী মোল্লা। মাতার নামঃ মালেকা খাতুন

জন্ম ঃ ২৬শে ভাদ্র, শনিবার-১৩৪০ বাংলা। চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ।

জন্ম স্থান ঃ গ্রাম আমিয়াপুর, পোঃ পাঠান বাজার, থানা মতলব, জিলা চাঁদপুর। দিল্লীর প্রখ্যাত বুজুর্গ ফেকাহবিদ আলিম এবং বাদশাহ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) ছিলেন লেখকের বংশের পূর্ব পুরুষ। হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) রচিত ফেকাহ নীতি শাস্ত্র নূরুল আনওয়ার গ্রন্থখানী দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফাজিল জামাতের পাঠ্য কিতাব। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী জনতা বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সালতানাতের পতনের পর হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) এর বংশধরগণের একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস গড়ে তুলেন। কালক্রমে ঐ বংশই বর্তমান আমিয়াপুর গ্রামে এসে নেছা বিবির সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। (পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।)

শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মজীবন ঃ লেখক প্রথমে মক্তবে কুরআন মজিদ ও কিছু কিতাব শিক্ষা করেন। ৪র্থ শ্রেণী পাস করার পর হিফজ আরম্ভ করেন এবং দু'বছর তিন মাসে হিফজ শেষ করেন। তারপর মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল (হাদীস) ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ ১৮৬৪ইং সালে উত্তীর্ণ হন। তারপর ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রি ও এমএ (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে স্টাইপেন্ডসহ পাস করেন। ১৯৭০ইং সালে আরবী ও জেনারেল শিক্ষা সমাপ্তির পর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাগলনাইয়া কলেজ ও নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। উচ্চতর শিক্ষা লাভের পাশাপাশি জিবীকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে ১৯৬৪-৭৮ইং হযরত তারেক শাহ (রহঃ) দরগাহ মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭৩ইং সালে ১ বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রভেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ ইং সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ১৯৭৫ সালে কয়েক মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে চাকুরী নিয়ে স্থায়ীভাবে ঢাকা চলে আসেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ইং সাল পর্যন্ত মধ্যখানে ৪ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্য্যালয়ে ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে পুনরায় ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খতীব, ওয়াজ নসিহত ও আহলে সুন্নাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন। বুখারী শরীফসহ তার লিখিত ও সম্পাদিত ১১ খানা গ্রন্থের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৯ খানা প্রকাশিত হয়েছে। রদ্দে বেহেস্তী জেওর ও প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ শিক্ষা পান্ডুলিপি আকারে আছে।

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ১৯৮০ইং সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের আজমীর শরীফে হযরত খাজা গরবী নওয়াজ (রহঃ) ও বেরেলী শরীফের আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত শাহ আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ) এর মাযার শরীফ যিয়ারত করে ফয়েজ ও বরকত লাভ করেন। ১৯৮২ইং সালে ইরাক সরকারের নিমন্ত্রণে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মোতামারে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশী প্রতিনিধি দলের সাথে গমন করেন। সেই সাথে পবিত্র হজ্ব ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং বাগদাদ শরীফের গাউসুল আযম (রাদিঃ)-এর মাযারসহ অসংখ্য ওলীর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন। ১৯৮৪ইং ও ১৯৮৫ইং সালে দু'বার ইরাক সরকারের আহ্বানে পুনরায় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন ও সেই সাথে যথাক্রমে হজ্জ ও ওমরাহ পালন করেন। বর্তমানে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি ছুন্নী গবেষণা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত আছেন। বাংলাদেশে ছুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহলে সুন্নাতের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার শাহজাহানপুরে ১১তলা বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত) গাউসুল আযম জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। শরিয়ত ও তরিকত প্রচারের কেন্দ্ররূপে উক্ত মসজিদ গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন মানত পূরণের ভিত্তিতে মানুষের সেচ্ছা অনুদানের ওপর মসজিদের উন্নয়ন কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন !

তারিখ ঃ ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ইং

كرامات غوث الاعظم (رضى الله عنه)

কারামাতে গাউসুল আ'জম (রাঃ)

KARAMAT-E GAUSUL AZAM (R)

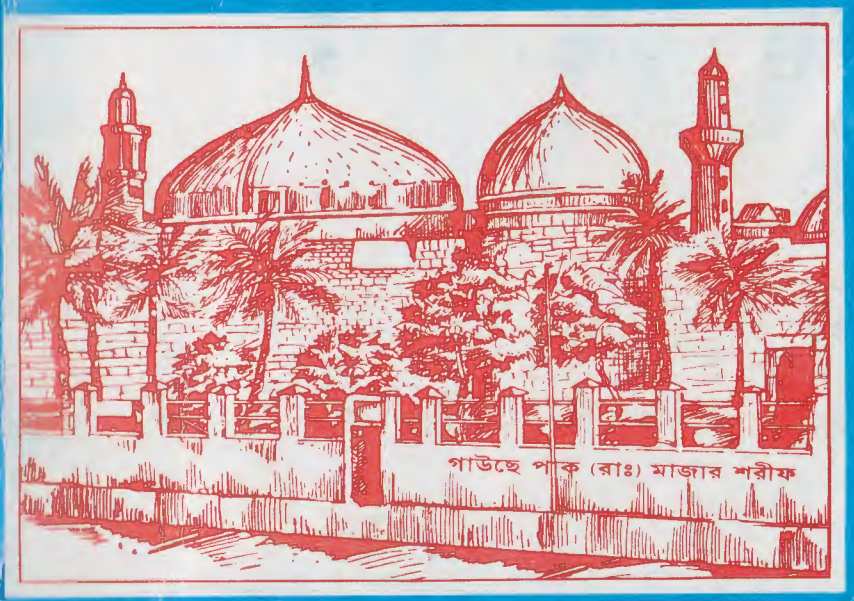

অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল

(এম এম, এম এ, বিসিএস)

লেখকের গ্রন্থাবলী

- ❑ বোখারী শরীফ বাংলা সংকলন
- ❑ রাহমাতুল্লীল আলামীন
- ❑ নূর-নবী (দঃ)
- ❑ কারামাতে গাউছুল আযম
- ❑ আহ্‌কামুল মাযার
- ❑ শিয়া পরিচিতি
- ❑ ইস্‌লাহে বেহেশতী জেওর
- ❑ ঈদে মিলাদুন্নবী
- ❑ গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস
- ❑ মিলাদ ও কিয়ামের বিধান
- ❑ প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাছায়েল শিক্ষা

প্রাপ্তি স্থান

১। গাউছুল আযম জামে মসজিদ
এ/৯, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

২। গাউছিয়া লাইব্রেরী
কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৩। ১০/২৯, তাজমহল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭

৪। কুতুবিয়া দরবার শরীফ
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মুদ্রণে ঃ এইচ কে প্রিন্টার্স ১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড। ফোন ঃ ৪০৭৮০৪

كَرَامَاتِ غَوْثُ الْاَعْظَمْ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ)

কারামাতে গাউসুল আ'জম (রাঃ)

KARAMAT-E GAUSUL AZAM (R)

অধ্যক্ষ হাফেজ এম, এ, জলিল
(এমএম এমএ, বিসিএস)

كَرَامَاتِ غَوْثُ الْاَعْظَم

কারামাতে গাউসুল আজম
KARAMAT-E-GAUSUL AZAM

অধ্যক্ষ আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল এম এ বিসিএস
সাবেক ডাইরেক্টর - ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
মহাসচিব - আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত,
অধ্যক্ষ - কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১০/২৯, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোনঃ ৯১১১৬০৭

প্রথম প্রকাশ ঃ
মার্চ-১৯৯৭

প্রকাশকঃ
আলহাজ্জ এ, কে, এম, আবদুর রেজ্জাক চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত এসপি)
৬১৯, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭।

মুদ্রণে ঃ এইচ কে প্রিন্টার্স
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৪০৭৮০৪।

সৌজন্য হাদিয়া ঃ ৩৫.০০ টাকা।

This book has been compilled by Principal Allama Hafiz Mohammad Abdul Jalil, Ex-Director Islamic Foundation and Secretary General Ahl-e-Sunnat wal-Jama'at to disclose the fact regarding the number of Gausul Azam and to present some karamat or Miracles of Gausul Azam before the readers on the basis of authentic sourses of Bahzatul Ashrar. Published by Alhaj A. K. M. Abdur Razzaque (S.P. RETD.) 619, North Shahjahanpur, Dhaka, Bangladesh.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	১
২।	গাউসুল আ'জমের জন্মকালে মুসলিম জাহানের অবস্থা	৪
৩।	গাউসে পাকের উর্দ্ধতন বংশ তালিকা (পিতৃকুল ও মাতৃকুল)	৬
৪।	হযরত গাউসুল আ'জমের পিতা-মাতার শাদী মোবারক	৬
৫।	গাউসে পাকের জন্ম বৃত্তান্ত	৮
৬।	কবিতায় গাউসে পাকের জন্ম বৃত্তান্ত ও কারামত (শানে গাউছিয়া)	৯
৭।	রূহানী জগতে গাউসে পাকের কারামত	১০
৮।	মাতৃ গর্ভের কারামত	১২
৯।	হযরত গাউসুল আ'জমের জন্ম	১৩
১০।	বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা	১৪
১১।	উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাগদাদ যাত্রা	১৫
১২।	ডাকাত দলের কবলে ঃ প্রথম মুরিদ	১৬
১৩।	মাদ্রাসা নেজামিয়াতে অধ্যয়ন ঃ ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেনের শিক্ষা লাভ – ওয়াজ নসিহত শুরু	১৭-১৮
১৪।	পাঠ্যাবস্থায় ও পরবর্তীকালে কঠোর সাধনা ও অগ্নি পরীক্ষা	১৯
১৫।	আধ্যাত্মিক কঠোর সাধনা	২০
১৬।	পীরের মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে	২১
১৭।	ধর্মীয় সংস্কারক রূপে	২২
১৮।	মহিউদ্দিন উপাধী লাভ	২৪
১৯।	৫২১ হিজরী থেকে ৫৬০ হিজরী পর্যন্ত ৪০ বৎসরের জীবন	২৪
২০।	হযরত গাউসুল আ'জমের পরিবার ও সন্তান-সন্ততি	২৫
২১।	দেশে দেশে গাউসে পাকের বংশধর	২৭
২২।	হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ)-এর তরিকতের ছিলছিলা	২৮
২৩।	গাউসে পাক (রাঃ) ও খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ)	২৯
২৪।	গাউসে পাকের কদম মোবারক খাজা গরীব নাওয়াজের মাথায় ও চোখে	২৯
২৫।	৩১৩ জন অলীর স্বীকৃতি	৩০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৬।	গাউসুল আ'জমের খানকায় গরীব নাওয়াজের চিল্লাকাশী	৩১
২৭।	হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ) হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিলেন ঃ লা-মাযহাবীর পরিচয়	৩২
২৮।	হযরত গাউসুল আ'জমের ইনতিকাল ও বেছালে হক্ব	৩৪
২৯।	পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম	৩৬
৩০।	গেয়ারভী শরীফ পালন	৩৬
৩১।	গাউসে পাকের সমসাময়িক কয়েকজন অলী আল্লাহর নাম	৩৭
৩২।	হযরত গাউসে পাকের চরিত্র মাধূর্য ও উচ্চ আখলাক	৩৮
৩৩।	আকৃতি ও প্রকৃতি	৩৮
৩৪।	কাজের সময় বন্টন ও নিয়মানুবর্তিতা	৩৯
৩৫।	গাউসে পাকের অমরবাণী	৩৯
৩৬।	সমাপ্তি স্তুতি	৪০

দ্বিতীয় অধ্যায় (কারামাত)

৩৭।	সমস্ত অলীগণের কাঁধে গাউসে পাকের কদম	৪১
৩৮।	শেখ জামালুদ্দীনের বর্ণনা	৪১
৩৯।	শেখ আবু সউদ ও শেখ আবদুল গনির বর্ণনা	৪২
৪০।	ইমাম আবু সাঈদ কালইউবীর বর্ণনা	৪২
৪১।	হায়াতুন্নবী (দঃ)-এর হস্ত মোবারক চুম্বন	৪৩
৪২।	রান্না করা মুরগী জীবিত করা	৪৩
৪৩।	হাওয়ায় চিলকে দ্বিখন্ডিত করা ও পূনঃজীবিত করা	৪৪
৪৪।	১২ বৎসর পর ডুবন্ত নৌকাসহ বরযাত্রীদের পূনঃজীবন লাভ	৪৪
৪৫।	যুগ ও কাল গাউসে পাককে ভবিষৎতের গায়েবী সংবাদ প্রদান	৪৫
৪৬।	গাউসে পাকের উছিলায় বিপদ দূর হয়	৪৬
৪৭।	তাকদীর পরিবর্তনে গাউসে পাকের ক্ষমতা	৪৬
৪৮।	কেয়ামত পর্যন্ত সকল অলী-আউলিয়া গাউসে পাকের মুখাপেক্ষী	৪৭
৪৯।	গাউসে পাক বেলায়েত-গগনের সূর্য এবং অন্যরা চন্দ্রতূল্য	৪৭
৫০।	জন্ম দিনেই রমজানের রোজা পালন (বিশ্বজগত ওলীগণের দৃষ্টিতে)	৪৭-৪৮
৫১।	মাতৃ গর্ভে ১৮ পারার হাফেজ	৪৯
৫২।	বাঘের সুরতে ভন্ড ফকির হত্যা ঃ মায়ের আবরু রক্ষা	৪৯
৫৩।	বেহেস্তী ও দোজখীদের জুতা পৃথক করণ	৫০
৫৪।	গাউসুল আ'জমের প্রথম মুরিদ	৫০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৫।	এক অলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রাপ্তি	৫১
৫৬।	বায়ুর উপর আধিপত্য ঃ দূরদেশ থেকে গাউসে পাকের ওয়াজ শ্রবন	৫৩
৫৭।	গায়েবী ওড়নার আগমন	৫৪
৫৮।	চোরকে কুতুবে পরিণত করা	৫৪
৫৯।	গাউসে পাকের বাবুর্চীর উছিলায় ৭০জন কুতুবের গায়েবী খানা প্রাপ্তি	৫৬
৬০।	গাউসে পাকের পোষা কুকুর কর্তৃক ভন্ড ফকিরের ব্যাঘ্র-ভক্ষণ	৫৭
৬১।	একই সময়ে ৭০ জন মুরিদের বাড়ীতে ইফতার	৫৮
৬২।	১৩ জন খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী	৫৯
৬৩।	শয়তানের ধোকা থেকে আত্মরক্ষা	৬০
৬৪।	ছেলেকে মেয়েতে রূপান্তর করা	৬০
৬৫।	মুনকার নকীরের সাথে বাহাস	৬১

তৃতীয় অধ্যায়

৬৬।	কৈফিয়ত	৬৩
৬৭।	"গাউসুল আ'জম পদবীর পদমর্যাদা "	৬৩
৬৮।	গাউসুল আ'জম কতজন?	৬৫
৬৯।	বিশ্লেষণ	৬৬
৭০।	গাউসুল আ'জম ও কুতুবে আকবর-এর মধ্যে পার্থক্য কি?	৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

৭১।	গাউসে পাকের মূল জীবনীগ্রন্থ বাহজাতুল আসরার লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (বিভিন্ন ইমামগণের মতামত)	৬৯
৭২।	বাহজাতুল আসরার গ্রন্থের মূল্যায়ন	
৭৩।	গাউসে পাকের জীবনীমূলক গ্রন্থ-নুজহাতুল খাতির ও ফাতাওয়ায়ে হাদিসিয়ার মূল্যায়ন	৭৪

প্রতিষ্ঠিত। সাতজন হবেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাঁচজন হবেন হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর কলবের উপর, তিনজন হবেন হযরত মীকাঈল (আঃ)-এর কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একজন হবেন হযরত ইসরাফিল (আঃ)-এর কলবের উপর। তাঁদের মধ্যে উপরের কেউ ইনতিকাল করলে নীচের স্তর থেকে এনে আল্লাহ তায়ালা উক্ত শূন্যস্থান পূরণ করেন। তাঁদের উছিলায়ই আমার উম্মতের বালা মুসিবত দূর হয়"। (সূত্রঃ মিশকাত শরীফঃ ইয়ামেন ও শাম অধ্যায়ের আব্‌দাল সম্পর্কীত হাদীসের টীকা নং-১)।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ওলীগণের উছিলায় আধ্যাত্মিক ও জাগতিক - উভয়বিদ কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে। যারা ওলীর কারামত স্বীকার করে না, তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। ওলীগণের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যাঁদের হাতে দুনিয়ার শাসনভার ও শৃঙ্খলা বিধানের ভার ন্যাস্ত, তাঁদের সংখ্যা তিনশত জন। তাঁদেরকে আখইয়ার (اَخْيَار) বলা হয়। যাঁদের উছিলায় রহমতের বারী বর্ষিত হয়ে জমিন ধন-ধান্যে ও শষ্য-শ্যামলে সুশোভিত হয়, তাঁদের সংখ্যা চল্লিশ জন। তাঁদেরকে আবদাল (اَبْدَال) বলা হয়। এ ছাড়া আরও সাতজন আছেন, যাঁদেরকে আব্‌রার (اَبْرَار) বলা হয়। পাঁচ জন এমন ওলী আছেন, যাঁদেরকে আওতাদ (اَوْتَاد) বলা হয়, তাঁদের উছিলায়ই পৃথিবী স্থীর থাকে। এমন তিনজন ওলী আছেন, যাঁদেরকে নকীব বলা হয়। আর এমন একজন আছেন, যাঁকে কুতুব (قُطْب) ও গাউস (غَوْث) বলা হয়। সর্বযুগের গাউস গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত বড়পীর আবদুল ক্বাদের জিলানী (রাঃ)। এজন্যই তাঁকে গাউসুল আজম বলা হয়। (সূত্রঃ গাওসুল আজম-মাওঃ নূরুর রহমান)।

اِرْغَامُ الْمُرِيْدِيْنَ নামক গ্রন্থে গাউসের সংগা এভাবে বলা হয়েছে ঃ

اَلْغَوْثُ هُوَالْقُطْبُ الَّذِىْ يُسْتَغَاثُ بِهٖ

অর্থাৎঃ গাউস এমন কুতুবকে বলা হয়, যাঁর কাছে বৈধ কোন জিনিস প্রার্থনা করা যায় এবং যাঁর উছিলায় ফরিয়াদ কবুল হয়"।

মূলতঃ অলী-আল্লাহগণ হলেন নবী করিম (দঃ)-এর ধর্মের সত্যিকার প্রমাণ। মোজেজার প্রতিচ্ছবিই হচ্ছে কারামত। অলীগণের কারামত মূলতঃ নবীজীর মোজেজা হতে উৎপন্ন ও উৎসারিত। নবীগণ হলেন মাসুম বা বে-গুনাহ এবং অলীগণ হলেন মাহফুজ বা গুনাহ্ হতে সংরক্ষিত।

অলী- আল্লাহগণের স্তর বিন্যাসে সামান্য কিছু মতপার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ আল্লামা সৈয়দ জামাআত আলী শাহ— যিনি মোহাদ্দেস আলীপুরী নামে সমধিক পরিচিত— তাঁর মতে ওলীদের শ্রেণী বিন্যাস হচ্ছে— আব্‌রার, আওতাদ, আব্‌দাল,

কুতুব, কুতুবুল আক্‌তাব, গাউস ও গাউসুল আজম। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর মতে ইমাম হাসান (রাঃ) সাহাবী ও প্রথম গাউসুল আজম, দ্বিতীয় গাউসুল আজম হচ্ছেন হযরত বড়পীর সাহেব (রহঃ) এবং তৃতীয় ও শেষ গাউসুল আজম হবেন ইমাম মাহ্‌দী। (সূত্রঃ নুজহাতুল খাতির-মোল্লা আলী ক্বারী)। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) যদিও গাউসিয়তে উজমার মর্তবা লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মূল পরিচয় হচ্ছে রাসুলুল্লাহর দৌহিত্র, সাহাবী ও বেহেস্তীগণের সর্দার হিসাবে, যা গাউসুল আজম পদবীরও অনেক উর্দ্ধে। তাই তাঁকে সর্বোচ্চ লকবে অর্থাৎ সাহাবী হিসাবেই আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

সেই যুগশ্রেষ্ঠ আউলিয়াকুল শিরোমনি হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর জীবনী ও কারামত লিখার সাধ্য কার আছে? বড় বড় মোহাদ্দেস ও ইমামগণ তাঁর অসংখ্য কারামত লিখে গেছেন। আল-আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেখ আবুল হাসান নূরুদ্দীন শাতনুফী (রহঃ) (৬৪৪-৭১৩) মাত্র দুই সনদের মাধ্যমে গাউসুল আজমের জীবনী ও কারামত সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। উক্ত গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'বাহ্‌জাতুল আস্‌রার'। উক্ত গ্রন্থখানী সনদের ক্ষেত্রে বোখারী শরীফ হতেও উন্নত। কেননা, বোখারী শরীফে সর্বনিম্ন সনদের স্তর হচ্ছে তিনটি। তা ও মাত্র ২২টি হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিন সনদের মাধ্যমে সংগৃহীত হাদীসকে 'ছুলাছিয়াতে বোখারী' বলা হয়। এই ২২টি হাদীস অতি নির্ভরযোগ্য। রাবীর সংখ্যা যত কম হবে, রেওয়ায়াতের নির্ভরযোগ্যতা ততই বেশী হবে। বাহ্‌জাতুল আসরার গ্রন্থটি মাত্র দুই রাবীর বর্ণনায় ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন শাত্‌নুফী (রহঃ) সংকলন করেছেন। সুতরাং কিতাবখানী যে অতি নির্ভরযোগ্য এবং মৌলিক-তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। অলী আল্লাহগণ উক্ত গ্রন্থখানাকে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ বলে ভক্তি করে থাকেন। পরবর্তী কালে উক্ত বাহ্‌জাতুল আসরারকে অবলম্বন করে আরো বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বাহজাতুল আসরার অবলম্বনে গাউসে পাকের জীবনী লিখে নাম রেখেছেন— "নুজহাতুল খাতিরিল ফাতির ফি তারজিমাতিশ শরীফ সাইয়েদ আবদুল কাদের"। হযরত গাউসে পাক আহ্‌লে বায়েতের অন্তর্ভূক্ত এবং ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ)-এর বংশধর। তাঁর মর্তবা ও মর্যাদা অতি উচ্চ। নামাজে দরূদ শরীফের মধ্যে আহ্‌লে বায়েত-এর উপর দরূদ পড়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। উক্ত দরূদে হযরত গাউসে পাকও শামিল রয়েছেন। তাঁর পবিত্র জীবনী ও কারামত লিখার অর্থ নিজেকে ধন্য করা। অধীন লেখক সে উদ্দেশ্যেই সংক্ষিপ্তভাবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হযরতের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কিছু কারামাত লিখার বাসনা রাখি।

হযরত গাউসুল আজমের জন্মকালে মুসলিম জাহানের অবস্থা

হযরত গাউসুল আজম বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) ৪৭১ হিজরীতে রমজান মাসের ১লা তারিখে সোবহে সাদেকের কিছু পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেদিনই প্রথম রোজা পালন করেন। সারাদিন মাতৃদুগ্ধ পান করা থেকে বিরত থাকেন। সূর্যাস্তের পর তিনি মাতৃদুগ্ধ দ্বারাই ইফতার করেন। ৯০ বৎসর হায়াত পেয়ে ৫৬১ হিজরীর রবিউস সানী মাসের ১১ তারিখে বাগদাদ শরীফে বর্তমান মাজার শরীফ সংলগ্ন খানকায় ইনতিকাল করেন। ঐ সময়কালে আব্বাসীয় খলিফাগণ দোর্দন্ড প্রতাপে রাজত্ব করছিলেন। আব্বাসীয় খেলাফত ১৩২ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ৬৭৩ হিজরীতে ধ্বংস হয়। মোট ৫৬১ বৎসর তারা খেলাফত পরিচালনা করেন। এসময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাগদাদ নগরী ছিল সভ্যতার লীলা ভূমি। প্রভাব, প্রতিপত্তি ও জাগতিক ঐশ্বর্যের কারণে শেষের দিকে খলিফাগণ ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। তাদের দরবারে উজির ও আমির পদে দু'ধরনের লোক নিয়োজিত ছিল। বনু বুইয়ারা ছিল শিয়া এবং তুর্কীরা ছিল সুন্নী। শিয়া ও সুন্নী মতবাদের দ্বন্দ্বে খেলাফত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অবশেষে শিয়া উজিরগণ ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৬৭৩ হিজরীতে মঙ্গোলীয়ার হালাকু খানকে দাওয়াত করে এনে বাগদাদ আক্রমণ করায় এবং আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস করে দেয়। আব্বাসীয় রাজত্বকালে ৩৭ জন খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা খলিফার নাম ছিল আবুল আব্বাস সাফফাহ্ এবং শেষ খলিফার নাম মোস্তাসিম বিল্লাহ। হযরত গাউসুল আজম (রাঃ) ২২ নং আব্বাসীয় খলিফা আল-মোস্তাজহির বিল্লাহর সিংহাসন আরোহনের বৎসর ৪৮৮ হিজরীতে বাগদাদ শরীফ গমন করেন উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এ সময় হতে ৫৬১ হিজরী সন পর্যন্ত দীর্ঘ ৭৩ বৎসরের মধ্যে তিনি কয়েকজন আব্বাসীয় খলিফা দেখেছিলেন। তাদের অনেকেই ছিলেন ভোগ-বিলাসী। আবার কেহ কেহ ভালও ছিলেন। তন্মধ্যে খলিফা মুসতানজিদ বিল্লাহ ও আল মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ গাউসে পাকের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর উপদেশ মত চলতেন। তারা নামে খলিফা হলেও খেলাফতের আইন-কানুন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হতোনা। ফলে ইসলামী আকায়েদের সুষ্ঠ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে দেশে বহু ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভব হয়। মোতাজিলা ফের্কাও কারামতা শিয়াদের প্রাদুর্ভাবে সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মুল ইসলাম থেকে এরা মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। মোতাজিলা ফের্কার অনুসারীরা সরকারী আনুকুল্য লাভ করে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারা কোরআন মজিদকে অন্যান্য সৃষ্টির মত একটি সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করতো— সময়ের বিবর্তনে যার বিবর্তন, পরিবর্তন ও ধ্বংস সাধন হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করতো। তারা ইহজগত ও পরজগতকে যুক্তিনির্ভর করে রেখেছিল। কবরের আজাব, মিজানের ওজন ও হিসাব কিতাবকে তারা অস্বীকার করতো। রাসুলুল্লাহর শাফায়াতকে তারা অযৌক্তিক বলতো। তাদের দৃষ্টিতে বেহেস্ত-দোযখের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। অলী আওলিয়াদের কারামতকেও তারা

অস্বীকার করতো। যুক্তির মাপকাঠিতে তারা নবীগণের বহু মোজেজাকে অস্বীকার করতো। এই ছিল মুসলিম সমাজে মোতাজিলা ফের্কার উৎপাত।

হযরত গাউসুল আজমের জমানায় আর একটি শিয়া ফের্কার উদ্ভব হয়। এদের নাম কারামতা। এই সম্প্রদায়টি ছিল চরমপন্থী। এরা খানায়ে কাবার হজ্‌রে আসওয়াদ লুণ্ঠন করে ইরানে নিয়ে যায় এবং ৩৫ বৎসর পর্যন্ত খোদার ঘর হজ্‌রে আসওয়াদ বিহীন অবস্থায় থাকে। অতঃপর তাদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয় এবং পাইকারীভাবে লোক মরতে থাকে। তারা ভয়ে ভীত হয়ে ঐ হজরে আসওয়াদকে ফেরত দিতে বাধ্য হয়। এই সম্প্রদায় নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত— ইত্যাদি ধর্ম-কর্মে বিশ্বাসী ছিল না। তারা হালালকে হারাম বলতো এবং হারামকে হালাল মনে করতো। অধম লেখক শিয়া ফের্কার ৬৪টি উপদল ও তাদের আকিদা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছি এবং নাম রেখেছি "শিয়া ফের্কা"। বিস্তারিত জানার জন্য উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করার জন্য বিনীত আবেদন রাখছি।

এই কারামতী ফের্কার প্রাদুর্ভাব পাক-ভারতেও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মোহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের পর এই ফের্কার লোকেরা পরবর্তীতে মুলতান ও পাঞ্জাব শাসন করতো। সুলতান মাহমুদ গজনবী কঠোর হস্তে তাদেরকে দমন করেন। ১৭ বার ভারত আক্রমণের অধিকাংশই ছিল কারামতী শাসকদের বিরুদ্ধে। ইতিহাসের যে কোন পাঠকই এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। এরূপে ইসলাম তথা সনাতন ইসলাম ধর্মের উপর যখন উপর্যুপরি বাতিল ফের্কার আক্রমণ চলছিল এবং ইসলামকে একেবারে দুর্বল করে মৃত প্রায় করে ফেলেছিল, ঠিক সেই মূহুর্তে আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরতে ও অসীম দয়ায় হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের মুজাদ্দিদ ও ইসলামের পুনর্জীবনদানকারী হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)কে প্রেরণ করলেন। সমস্ত জগৎবাসী তাঁর কাছে চির ঋণী। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সমস্ত বাতিল মতবাদ ও কুসংস্কার দূর করে ইসলামকে তার মূলরূপে পূনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

গাউসে পাকের উর্ধ্বতন বংশ তালিকা

পিতৃকুল	মাতৃকুল
১। হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)	১। হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)
২। " আবু সালেহ্ মুছা জঙ্গীদোস্ত (রহঃ)	২। " সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)
৩। " আবু আবদুল্লাহ আল জিবিল্লী (রহঃ)	৩। " সৈয়দ আবদুল্লাহ ছাওমাঈ জাহেদ (রহঃ)
৪। " ইয়াহ্ইয়া জাহেদ (রহঃ)	৪। " আবু জামাল (রহঃ)
৫। " মোহাম্মদ (রহঃ)	৫ " মোহাম্মদ (রহঃ)
৬। " দাউদ (রহঃ)	৬। " মাহমূদ (রহঃ)
৭। " মুছা ছানী (রহঃ)	৭। " আবুল আতা আবদুল্লাহ (রহঃ)
৮। " আবদুল্লাহ ছানী (রহঃ)	৮। " কামালুদ্দীন ইছা (রহঃ)
৯। " মুসা আল জুন (রহঃ)	৯। " মোহাম্মদ জাউয়াদ (রহঃ)
১০। " আবদুল্লাহ আল-মহয (রহঃ)	১০। " আলী রেজা (রহঃ)
১১। " হাসানুল মোসান্না (রহঃ)	১১। " মুছা কাজেম (রহঃ)
১২। " ইমাম হাসান (রাঃ)	১২। " ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)
১৩। " আলী (কঃ ওয়াজ) ও বিবি ফাতেমা (রাঃ)	১৩। " ইমাম বাকের (রাঃ)
	১৪। " ইমাম জয়নুল আবেদিন (রাঃ)
	১৫। " ইমাম হোসাইন (রাঃ)
	১৬। হযরত আলী (কঃ) ও বিবি ফাতেমা (রাঃ)

পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকে তিনি সৈয়দ ও আওলাদে রাসুল (দঃ)। তিনি আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী রাদিআল্লাহু আন্হুমা। শিয়ারা তাঁকে সৈয়দ ও আওলাদে রাসুল বলে স্বীকারই করেনা। কেননা, তিনি তাঁর গ্রন্থে শিয়াদেরকে আকিদায় ইয়াহুদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। (সূত্রঃ শুনিয়াতুত তালেবীন— কৃত হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ))।

হযরত গাউসুল আজমের পিতা-মাতার শাদী মোবারক

হযরত গাউসে পাকের পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন পারস্যের জিলান বা গীলান প্রদেশের অধিবাসী। তৎকালীন সময়ে গিলান প্রদেশটি বাগদাদের খলিফাদের অধীন ছিল। বাগদাদ শরীফ হতে গিলানের দূরত্ব ৪০০ মাইল উত্তর-পূর্বে। কারবালার ঘটনার পর উমাইয়া শাসনামলে রাজনৈতিক অত্যাচারে আরবের অনেক খান্দানী পরিবারই মক্কা ও মদিনা শরীফ ত্যাগ করে আরবের বাইরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইরাক, ওয়াছেত ও পারশ্যে হযরত আলী (কঃ) এবং ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। সে সূত্রে ইমাম বংশের অনেকেই হিজরত করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন। হযরত গাউসুল আজমের পূর্ব পিতৃ পুরুষ ও মাতৃ পুরষগণ এভাবেই এককালে জিলান প্রদেশে নিরাপদ আশ্রয়ে হিজরত করেন।

হযরত বড়পীর সাহেবের পিতা সৈয়দ আবু সালেহ মুছা জঙ্গী দোস্ত(রহঃ) অতি উঁচুস্তরের একজন বুজুর্গ ও মোত্তাকী ছিলেন। তিনি রিয়াযত ও কঠোর সাধনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি প্রায় সময়ই বনে-জঙ্গলে ও নদীর তীরে একাকী সাধনা করতেন। তিনি কিভাবে সংসারে জড়িত হলেন, সে সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ ঘটনা আরমান সারহাদী রচিত "সাওয়ানেহে গাউসে আজম" গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

হযরত আবু সালেহ মুছা জঙ্গী (রহঃ) জিলানের কোন এক নদীর তীরে এবাদত, রিয়াযত ও মুরাকাবা মুশাহাদায় নিমগ্ন থাকতেন। দিনের পর দিন অর্ধাহারে ও অনাহারে থাকতেন। একবার তিনি নদীর তীরে গিয়ে দেখেন— নদীর তীর ঘেঁষে একটি পাকা আপেল নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাড়নায় তিনি ফলটি তুলে এনে খেয়ে ফেললেন। পরক্ষণেই তাঁর মধ্যে দারুন অনুশোচনা দেখা দিল। মালিকের অনুমতি ছাড়া পরিত্যাক্ত ফলটি খাওয়া ঠিক হয়নি— যদিও শরীয়তে এ অবস্থায় ভেসে যাওয়া ফল খাওয়া বৈধ। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেনঃ নিশ্চয়ই উজানের কোন মালিকের বাগানের ফল পানিতে পড়ে স্রোতের টানে চলে এসেছে। আবু সালেহ মুছা জঙ্গী (রহঃ) তৎক্ষনাৎ ফলের মালিকের অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়লেন। অনেক দূর চলার পর নদীর কিনারায় একটি আপেলের বাগান দেখতে পেলেন। আপেল বৃক্ষের একটি ডালা নদীর উপর ঝুঁকে আছে। ঐ ডালে পাকা আপেল দেখা যাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ফলটি এ গাছেরই। বাগানের মালিকের খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, তাঁর নাম সৈয়দ আবদুল্লাহ্ ছাওমাঈ (রহঃ)। তিনি তৎক্ষনাৎ সৈয়দ আবদুল্লাহ ছাওমাঈ (রহঃ)-এর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রশান্ত ও নূরানী চেহারা দেখে ক্ষমার আশায় বুক বেঁধে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সৈয়দ আবদুল্লাহ ছাওমাঈ (রহঃ) সৈয়দ আবু সালেহ মুছা জঙ্গীর চেহারার দিকে নজর করেই বুঝতে পারলেন— ইনি সাধারণ যুবক নহেন। এক অলীর হৃদয় অপর অলীর দর্পন স্বরূপ। হযরত আবদুল্লাহ ছাওমাঈ (রহঃ)-এর হৃদয় দর্পনে সৈয়দ আবু সালেহ মুছা জঙ্গীর আসল চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি তাঁর হাকিকত বুঝতে পারলেন। এমন পরশমণিকে হাত ছাড়া করা যায়না। তিনি তাঁকে ধরে রাখার উপায় হিসাবে শর্ত দিলেন— যদি বার বৎসর আমার গৃহে থেকে আমার খেদমত করতে পার, তাহলে ক্ষমা করতে পারি। সৈয়দ আবু সালেহ মুছা জঙ্গী (রহঃ) অগত্যা রাজী হলেন— তবুও খোদার শাস্তি হতে যদি নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। বান্দার হক বড়ই কঠিন।

এখন শুরু হলো সাধনার আর এক স্তর। হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ ছাওমাঈ (রহঃ) তাঁকে অন্য কাজে লাগিয়ে দিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনা ও শিক্ষা-দীক্ষার কাজে তিনি তাঁকে নিয়োজিত করলেন। পরশমণির পরশে থেকে বার বৎসরে. তিনি কামালিয়াতের উচ্চস্তরে উন্নীত হলেন। এবার বিদায়ের পালা। তিনি মনিবের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন। এমন পরশমণিকে হাত ছাড়া করতে হযরত ছাওমাঈ

(রহঃ)-এর ইচ্ছা হলোনা। তাই তিনি একটি নূতন শর্ত জুড়ে দিলেন। তিনি বললেনঃ আপেলের ঋণমুক্ত হতে চাইলে আমার একটি প্রস্তাব তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। আমার একটি মেয়ে আছে। সে অন্ধ, খোঁড়া ও বধির। তাকে তোমার বিবাহ করতে হবে। নতুবা ঋণমুক্তি নেই।

হযরত আবু সালেহ মুছা জঙ্গী (রহঃ) ভাবলেন— ক্ষমা না নিয়ে চলে গেলে সব পরিশ্রমই বৃথা। তদুপরি পরকালের শাস্তি তো আছেই। সুতরাং জীবন যৌবনের সব স্বাদ বিসর্জন দিয়ে হলেও ক্ষমা নিতে হবে। তাই তিনি অগত্যা এ বিবাহে রাজী হলেন। বিবাহ সুসম্পন্ন হলো। বিবাহ বাসরে দুলহান একাকী বসে আছেন। শ্বশুর সাহেব নূতন জামাইকে বাসর ঘরে পৌছিয়ে দিয়ে চলে আসলেন। হযরত আবু সালেহ বাসর ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এক অনিন্দ্য সুন্দরী চক্ষুষ্মান দুলহান বসে আছেন। তাঁর হাত, পা, কান সবই ঠিক। তিনি ভাবলেন— বোধহয় মনিব আর এক অগ্নি পরীক্ষায় তাঁকে নিক্ষেপ করেছেন। তিনি পিছ পা হয়ে চলে আসছিলেন। এমন সময় শ্বশুর সাহেব এগিয়ে এসে বললেনঃ বাবা! তুমি আমার কথার মর্ম বুঝতে পারনি। আমার মেয়েকে আমি অন্ধ বলেছিলাম এজন্যে যে, সে অন্য পুরুষের দিকে কোন দিন তাকায়নি। তাকে খোঁড়া বলেছিলাম এ জন্যে যে, সে কোনদিন অন্যায় পথে পা বাড়ায়নি। তাকে বধির বলেছিলাম এ কারণে যে, সে কোনদিন অশ্লীল ও অধর্মের কথা তাঁর কানে শোনেনি। এবার তোমার চরিত্রের পরীক্ষা শেষ হলো। তোমার মত জামাই পেয়ে আমি ও আমার মেয়ে ধন্য। হযরত সৈয়দ আবু সালেহ মুছা জঙ্গী (রহঃ) শ্বশুরের কথা শুনে মনে মনে শুকরিয়া আদায় করলেন। এমন স্ত্রী যার ঘরে আছে, দুনিয়াতেই তার বেহেস্ত। পরকালের হুর ও গেলমান তার কাছে তুচ্ছ। এই নব পরিণীতা বিবির নামই সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা। যাঁদের ঘরে পয়দা হলেন গাউসে ছামাদানী, নূরে ইয়াজদানী, মাহবুবে সোব্হানী, কুতুবে রাববানী, গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু। এমন পিতা-মাতা হলে সন্তানও এমনই হবে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। বার বৎসর যাঁর ঘরে থেকে খেদমত করলেন আবু সালেহ মুছা জঙ্গী, বিবাহের পূর্বে একটিবারও দেখলেন না সেই মনিব কন্যাকে! শরীয়ত কাকে বলে এবং শরয়ী পর্দা কাকে বলে— পাঠক পাঠিকারা একটু চিন্তা করে দেখুন এবং অনুসরণ করতে চেষ্টা করুন। (সূত্রঃ গাউসুল আজম)।

গাউসে পাকের জন্ম বৃত্তান্ত

হযরত সৈয়দ আবু সালেহ মুছা জঙ্গীদোস্ত (রহঃ) ও সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)-এর শুভ বিবাহের পর নিঃসন্তান অবস্থায় বহু বৎসর কেটে যায়। পিতা বৃদ্ধ, মাতাও বৃদ্ধা। সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমার বয়স তখন ৬০ বৎসর। এ বয়সে সাধারণতঃ সন্তান ধারণের ক্ষমতা থাকেনা। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে এ বয়সেই তিনি গর্ভে ধারণ করলেন জগৎ বিখ্যাত ও সর্ব শ্রেষ্ঠ ওলী গাউসুল আজম আবদুল কাদের

জিলানী (রাঃ)কে। হযরত গাউসুল আজম মায়ের গর্ভে আসার পর পরই শুরু হয় কারামতের অপূর্ব খেলা। প্রথম মাসেই বিবি হাওয়া (আঃ) স্বপ্নে ধরা দিলেন সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমার সাথে। তিনি বলে গেলেন, তোমার গর্ভে গাউসুল আজমের আগমন হয়েছে। তুমি ধন্য। দ্বিতীয় মাসে বিবি সারাহ (আঃ) এসে সুসংবাদ দিলেন তোমার ঘরে মারেফাতের খনির আগমন হয়েছে। তৃতীয় মাসে বিবি আছিয়া এসে সুসংবাদ দিলেন— তোমার ঘরে ভেদতত্বের মালিক আগমন করেছেন। চতুর্থ মাসে বিবি মরিয়ম, পঞ্চম মাসে বিবি খাদিজা (রাঃ), ৬ষ্ঠ মাসে হযরত আয়েশা (রাঃ) এসে খবর দিলেন— তোমার ঘরে ওলীকুল শিরোমনি আগমন করবেন। সপ্তম মাসে বিবি ফাতেমা (রাঃ) স্বপ্নে বলে গেলেন— উম্মুল খায়ের! তোমার ঘরে আমার বংশের নয়নমনির আগমন হচ্ছে। অষ্টম মাসে বিবি জয়নব, নবম মাসে বিবি ছকিনা (রাঃ) স্বপ্নে বলে গেলেন— তোমার সন্তানের গুনে জিলান ভূমি ধন্য হবে। এভাবে শুভ স্বপ্ন দেখতে দেখতে নয় মাস কেটে গেলো। দশম মাসে পহেলা রমজানের রাত্রির শেষ ভাগে সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ ধরে বিশ্ব জগতকে আলোকিত করে ধরার বুকে আগমন করলেন। তাঁর আগমনে ইসলাম লাভ করলো পুনঃজীবন। অধীন লেখক "ঈদে মিলাদুন্নবী" গ্রন্থে কবিতাকারে গাউসে পাকের জন্ম বৃত্তান্ত ও কারামত এভাবে লিখেছি।

কবিতায় গাউসে পাকের জন্ম বৃত্তান্ত ও কারামত (শানে গাউছিয়া)

১। আয় বড়পীর আবদুল কাদের - জিলানের জিলানী, তোমারি নামের গুনে আগুন হয়ে যায় পানি।

২। জন্ম তোমার জিলানেতে তরিকা হয় কাদেরিয়া, আবু ছালেহ্ মুছা জঙ্গী-হলেন যে তোমার পিতা,
উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা তোমার হয় জননী। তোমারি —

৩। ষাইট বৎসর বয়সেতে গর্ভে ধরেন ফাতেমা, খবর শুনে মহাখুশী- হলেন গো তোমার পিতা,
শেষ বয়সে সন্তান আশায়- খুশী জনক-জননী। তোমারি ---

৪। প্রথম মাসেতে স্বপ্নে এলেন বিবি মাঁ হাওয়া, শুন শুন শুন ওগো - উম্মুল খায়ের ফাতেমা,
তোমার কোলে আসবেন যিনি- গাউসুল আজম নাম শুনি। তোমারি --- - - --

৫। দ্বিতীয় মাসেতে এলেন বিবি সারাহ্ জননী, শুন ওগো মা ফাতেমা শুন হোসেন নন্দিনী,
তোমার ঘরে পয়দা হবে -মারেফতেরি খনি। তোমারি ------

৬। তৃতীয় মাসের কালে এলেন বিবি আছিয়া, শুন ওগো মা ফাতেমা শুন তুমি মন দিয়া,
তোমার গর্ভে বসে আছেন- ভেদের মালীক হয় যিনি। তোমারি ------

৭। চার মাসের কালে মরিয়ম- পঞ্চমেতে খাদিজা, ছয় মাসে দিলেন খবর - মা আয়েশা আসিয়া,
তোমার গর্ভে পয়দা হবে ওলীকুল শিরোমনি। তোমারি -------

৮। সাত মাসের কালে আসলেন— মা ফাতেমা জননী, শুন মাগো তুমি আমার হোসেনের নয়নমনি,
তোমার কোলে আসবে যিনি আমার নয়নমনি। তোমারি ------

৯। আট মাসে বিবি জয়নব, নবমেতে ছকিনা, এসে বলেন শুন ওগো— উম্মুল খায়ের ফাতেমা,
তোমারি সন্তানের গুনে ধন্য জিলান পাক ভূমি। তোমারি -------

১০। রমজানের প্রথম রাতে তোমার শুভ জন্ম হয়, দিনের বেলায় খাওনা দুধ গো তাতে তোমার রোজা হয়,
কেউ জানেনা চাঁদের খবর জানে- গাউসে ছামদানী। তোমারি .....

১১। গর্ভে বসে মায়ের মুখে শুনে কোরআনের বাণী, হেফজ করলে অর্ধ কোরআন ওগো গাউছে জিলানী,
মায় জানেনা ছেলের খবর- জানে আল্লাহ্ গনী। তোমারি --------

১২। দোজখেতে তোমার গোপন— ভেদ দিলে ছাড়িয়া, এক পলকে ওগো গাউস যাবে আগুন নিভিয়া,
অধমেরে পার করিও- হাশরের দিনে তুমি। তোমারি -------

১৩। যেই নজরে চোরকে তুমি দিলে কুতুব বানাইয়া, সেই নজরে করো দয়া ওগো দয়াল গাউছিয়া,
সকলেরে দাও গো তুমি- তোমার সেই নজর খানী। তোমারি -------

১৪। মুরিদী লা-তাখাফ শুনি তোমার মুখের জবানী, চরন তলে দিলাম সঁপে জলিলের জীবন খানী,
রোজ হাশরে মুরিদগনে কোলে তুলে নাও তুমি। তোমারি -------

রূহানী জগতে গাউসে পাকের কারামত

১। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর মক্কা শরীফের অদূরে নোমান পাহাড়ের পাদদেশে, মতান্তরে বেহেস্তে তাঁর পৃষ্ঠদেশ হতে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনশীল সমস্ত সন্তান গণের রূহকে মর্তবা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে দলবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের শ্রেণী, আউলিয়ায়ে কেরামের শ্রেণী, ওলামায়ে কেরামের শ্রেণী, সাধারণ মুমিন গণের শ্রেণী ও কাফেরদের শ্রেণী পৃথক পৃথকভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "আমি কি তোমাদের রব নই? তদুত্তরে সকলে একের পর এক বলতে লাগলো بَلٰى-হাঁ। এই অঙ্গীকারকে রোজে আজলের অঙ্গীকার বলা হয়। হযরত আদম (আঃ) অবাক বিস্ময়ে আরজ করলেন— হে আল্লাহ! এরা কারা? আল্লাহ তায়ালা বললেন— এরা তোমার আওলাদ। হযরত আদম (আঃ) লক্ষ্য করলেন— আউলিয়ায়ে কেরামের সারি হতে একজন লোক আম্বিয়ায়ে কেরামের দলে শামিল হওয়ার জন্য অগ্রসর হতে চায়, আর ফেরেস্তারা বারে বারে তাঁকে আউলিয়ায়ে কেরামের দলে ধরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধরে রাখতে পারছিলেন না। অবশেষে গায়েবী আওয়াজ হলো— হে মুহিউদ্দীন! স্থির হও। তোমার মধ্যে নবীগণের দলভুক্ত হওয়ার মত যোগ্যতা আছে বটে। কিন্তু তোমাকে সর্বশেষ নবীর উম্মত করেই প্রেরণ করা হবে। তবে জেনে রেখো, তোমাকে আউলিয়াকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হবে। তোমার পদযুগল আউলিয়াগণের কাঁধের উপর হবে। অতঃপর

তিনি শান্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন। (সূত্রঃ হযরত গাউসুল আজম-কৃত মাওঃ নূরুর রহমান) এমন আলেমে হককানী রাববানী সম্পর্কেই হুজুর আকরাম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ অর্থাৎ "আমার উম্মতের জাহেরী-বাতেনী ওলামাগণ বণী ইসরাইলের নবীগণের ন্যায়" (ইল্‌ম এর ক্ষেত্রে)। (সূত্রঃ তাফসীরে নাঈমী-মুফতী আহমদ ইয়ার খান)।

২। নবী করিম (দঃ) যেদিন মেরাজে গমন করেন, সেদিন জিবরাঈল (আঃ), মিকাঈল (আঃ) ও ইসরাফিল (আঃ) ৭০ হাজার ফেরেস্তাসহ বোরাক নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমায় বিবি উম্মে হানির ঘরের সামনে হাজির। নবী করিম (দঃ) কে উর্দ্ধজগতে ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত করে বোরাকে আরোহনের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বোরাক একটু নাজ ও নখ্‌রা করে দুলছিল। নবী করিম (দঃ) আরোহন করতে একটু অসুবিধা বোধ করছিলেন। এমন সময় হযরত গাউসুল আজমের রূহ মোবারক সুরত ধারণ করে নিজের কাঁধ পেতে দিলেন। নবী করিম (দঃ) তাঁর কাঁধে পা রেখে বোরাকে সওয়ার হয়ে বললেনঃ "যেভাবে এখন আমি আমার পা তোমার কাঁধের উপর স্থাপন করলাম, সেভাবে আমার উম্মতের ওলীগণের কাঁধের উপরও তোমার পা স্থান পাবে"। (সূত্রঃ গাউসে আজমের জীবনী ও কারামত-কৃত মাওঃ নূরুর রহমান)। হযরত গাউসুল আজম তো নবী পাকের আহ্‌লে বায়েত। সুতরাং নবী পাকের সাথে তাঁর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট— রূহানী ও জিস্‌মানী-উভয় দিক থেকে। কাশ্‌ফের মাধ্যমে অবগত বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না। এ ঘটনাটিও রূহানী জগতের।

৩। মাওলানা নূরুর রহমান তাঁর সংকলিত গাউসুল আজম হযরত আবদুল কাদের জিলানী গ্রন্থে লিখেছেন— "হযরত গাউসে পাক স্বয়ং বলেন, মিরাজ শরীফের রাত্রে যখন হুজুর (দঃ) সিদরাতুল মুন্তাহা নামক স্থানে তশরীফ নিলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) থেমে গেলেন এবং বললেন لَوْدَنَوْتُ مِثْلَ شَعْرَةٍ لَاحْرَقْتُ অর্থাৎ আমি যদি আর এক কেশাগ্র পরিমাণ অগ্রসর হই, তাহলে নূরের তাজাল্লীতে আমার নূরের পাখা জ্বলে যাবে। তখন আল্লাহ তায়ালা আমার (আবদুল কাদের) রূহকে হুজুরে আকরাম (দঃ)-এর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং আমি হুজুরের কদমবুচী করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। অতঃপর আমি রফরফের আকার ধারন করে হুজুর (দঃ)কে আমার পিঠে আরোহন করালাম। হুজুর (দঃ) আমাকে বললেনঃ হে প্রিয় বৎস! আজ আমার কদম তোমার কাঁধের উপর, তোমার কদমও সমস্ত আউলিয়াদের কাঁদের উপর হবে।

কোন কোন মাশায়েখ আরও রেওয়ায়াত করেছেন যে, মিরাজ শরীফে যখন নবী করিম (দঃ) আরশ মোয়াল্লায় গমন করলেন, তখন আরশকে উচু দেখতে পেলেন। কিভাবে আরশে আরোহন করবেন, সে বিষয়ে তিনি চিন্তা করলেন। এমন সময় এক নূরানী যুবক সামনে এসে কাঁধ পেতে দিলেন। হুজুর (দঃ) তাঁর কাঁধে পা মোবারক রেখে আরশে আরোহন করলেন। এমন সময় গায়েবী আওয়াজ ভেসে আসলো— হে

প্রিয় হাবীব! ইনি আপনার বংশের সন্তান। তাঁর নাম হবে মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের। নবী করিম (দঃ) এবারও খুশী হয়ে বললেনঃ আমার কদম তোমার কাঁধে, তোমার কদম অলীদের কাঁধে হবে। উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলো কাশ্‌ফের দ্বারা উদঘাটিত।

মাতৃগর্ভের কারামত

১। হযরত গাউসুল আজমের আম্মাজান সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) বলেনঃ যেদিন আমার সন্তান ভূমিষ্ট হয়, সেদিন আমার স্বামী সৈয়দ আবু সালেহ্ মুছা জঙ্গী স্বপ্নে দেখেন, নবী করিম (দঃ) প্রধান সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে আমাদের ঘরে তশরীফ আনলেন এবং আমার স্বামীকে বললেনঃ

يَا اَبَا صَالِحٍ اَعْطَاكَ اللّٰهُ اِبْنًا صَالِحًا وَهُوَ وَلَدِىْ وَمَحْبُوْبِىْ وَمَحْبُوْبُ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى وَسَيَكُوْنُ لَهٗ شَاْنٌ فِى الْاَوْلِيَاءِ وَالْاَقْطَابِ كَشَاْنِىْ بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ

অর্থাৎ "হে আবু সালেহ্! আল্লাহ পাক তোমাকে একজন নেককার ছেলে সন্তান দান করেছেন। সে আমার বংশধর, আমার প্রিয় এবং আল্লাহ্ সুবহানাহুরও প্রিয়। সে শীঘ্রই আউলিয়া ও কুতুবগণের মধ্যে এমন মর্যাদা লাভ করবেন, যেমন আম্বিয়া ও রাসুলগণের মধ্যে আমার মর্যাদা। (সূত্রঃ গউসুল আজম-কৃত মাওঃ নূরুর রহমান)।

২। হযরত বড়পীর (রাঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অলৌকিক ক্ষমতাবলে ব্যাঘ্ররূপ ধারন করে এক ভন্ড ফকিরকে হত্যা করে মায়ের আবরু রক্ষা করেছিলেন।

ঘটনা ছিল এই ঃ একদিন এক ভিক্ষুক ভিক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত সৈয়দ আবু সালেহ্ মুছা জঙ্গী (রহঃ)-এর বাড়ীতে এসে ভিক্ষা চাইতে লাগলো। ঘটনাক্রমে সেদিন বাড়ীতে পুরুষ লোক কেউ ছিলেন না। ভিক্ষুক ক্ষুধার তাড়নায় কাকুতি মিনতি করতে লাগলো। পূন্যবতী সৈয়দা উম্মুল খায়ের দয়া পরবশ হয়ে পর্দার আড়াল থেকে কিছু খানা ভিক্ষুককে বাড়িয়ে দিলেন। খানা খেয়ে ভিক্ষুক খালী বাড়ী দেখে অন্দর মহলে প্রবেশ করতে উদ্যত হলো। সৈয়দা উম্মুল খায়ের দিশেহারা হয়ে ভিক্ষুকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য খোদার কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। আল্লাহর কুদরতে জননীর এই চরম বিপদের সময় হযরত আবদুল কাদের জিলানীর রূহ মোবারক মাতৃগর্ভ হতে বের হয়ে একটি বাঘের রূপ ধারন করে মূহুর্তের মধ্যে ভিক্ষুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করে পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করলেন। জননী কিছুই টের করতে পারলেন না। তিনি শুধু এতটুকুই দেখতে পেলেন যে, কোথা হতে একটি বাঘ এসে ভিক্ষুককে হত্যা করে আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরবর্তীতে কোন এক সময় গাউসুল আজমের আম্মাজান কোন কারণে একটু রাগ করে বলেছিলেন, আবদুল কাদের! তোমার জন্য তোমার শিশুকালে কত কষ্ট করেছি— মনে আছে কি? এটা ছিল সন্তানের প্রতি মায়ের আদরের শাসন। হযরত বড়পীর সাহেবও বলে ফেললেন— আমিও তো গর্ভকালীন সময়ে আপনার একটি উপকার করেছিলাম। সে কথা কি আপনার মনে নেই? মাতা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— সেটা কি? হযরত বড়পীর সাহেব (রহঃ) বললেন— ভিক্ষুককে যে বাঘটি হত্যা করে আপনার আবরু রক্ষা করেছিল, সে তো আমিই ছিলাম। একথা শুনে সৈয়দা উম্মুল খায়ের অবাক বিস্ময়ে মনে মনে ভাবলেন— আমার এ সন্তান কালে মানুষের মত মানুষ হবে। এর পর থেকে তিনি আর কোন দিন পুত্রের প্রতি বিরক্ত হননি। (সূত্রঃ মানাক্বেবে গাউসিয়া)।

হযরত গাউসুল আ'জমের জন্ম

তৎকালীন পারশ্য, বর্তমান কালের ইরান দেশের অন্তর্গত জিলান বা গীলান শহরে নায়েক বা নিক্‌বা নামক স্থানে ৪৭১ হিজরী, মোতাবেক ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা রমজান সোমবার সোব্‌হে সাদেকের সামান্য পূর্বে অলিকুল সম্রাট গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আন্‌হু জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হযরত সৈয়দ আবু সালেহ্ মুছা জঙ্গীদোস্ত (রহঃ) এবং মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল খায়ের আমাতুল জাব্বার ফাতেমা (রহঃ)। পিতা হাসান বংশীয় এবং মাতা হোসাইন বংশীয়। উভয় দিক থেকে তিনি সৈয়দ ও আওলাদে রাসুল (দঃ)। নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র রক্তধারা গাউসে পাকের শরীরে প্রবাহমান। সকল অলীগণের গর্দানে তাঁর পবিত্র কদম। এজন্যই তাঁর লকব "মালিকুর রিকাব"। "মানাক্বেবে গাউছিয়া" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত গাউসুল আ'জমের আম্মাজান সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ "আবদুল কাদের রমজান শরীফের প্রথম রাত্রে জন্ম গ্রহণ করেছেন। জন্মদিন থেকেই দিনের বেলায় তিনি আমার দুধ পান করেননি। ইফতারের সময় থেকে সোব্‌হে সাদেক পর্যন্ত সারারাত্র তিনি দুধ পান করতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর এ কারামত সারা জিলান শহরে রাষ্ট্রময় হয়ে যায়"।

৪৭১ হিজরীর শাবান মাসের ২৯শে তারিখ জিলানের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। লোকেরা রমজানের চাঁদ দেখতে না পেয়ে পরদিন সাবধানতা বশতঃ সেহেরী খেয়ে নিলেন এ আশায় যে, হয়তো অন্য কোন স্থান থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ আসতে পারে। পরদিন একজন আল্লাহ ওয়ালা দরবেশের নিকট চাঁদের বিষয়ে জানতে চাইলে উক্ত দরবেশ বললেনঃ আবু সালেহ মুছা জঙ্গীকে জিজ্ঞাস করো— তাঁর নবজাত সন্তান আজকে সোব্‌হে সাদেক থেকে মায়ের দুধ পান করেছে কিনা। খবর নিয়ে দেখা গেল— নবশিশু সোব্‌হে সাদেক থেকে দুধ পানে বিরত রয়েছেন। এমন সময়ই খবর হলো— গতকাল চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জিলান শহরের লোকেরা এই

সংবাদ জেনে হযরত গাউসুল আ'জমের প্রথম রোজা রাখার কারামত দর্শনে হতবাক হয়ে গেল। দেশের জাহেরী আলেম উলামাগণ আকাশের নবচাঁদ দর্শনে বিফল হলেও বাতেনী শক্তির অধিকারী গাউছে পাক (রাদিঃ) ঠিকই চাঁদ দর্শন করে প্রথম রোজা পালন করেছিলেন। এখানে এসেই প্রকৃত নায়েবে নবীর পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুকালে গাউসে পাকের জেকের-আজকার ও দোলনায় থাকাকালীন তাঁর রোজা রাখার প্রতি ইঙ্গিত করেই পরবর্তীকালে তিনি নিজেই একটি কাছিদায় একথা উল্লেখ করেছেন। 'তারগীবুল মানাজের' নামক গ্রন্থে উক্ত কাছিদার সংশ্লিষ্ট পংতি উল্লেখ করা হয়েছে। কবিতাংশটি নিম্নরূপঃ

بِدَايَةُ اَمْرِىْ ذِكْرُهٗ مَلَاءُ اْلفَضَا + وَصَوْمِىْ فِىْ مَهْدِىْ بِهٖ كَانَ -

অর্থ ঃ "আমার শৈশবকালের জিকির-আজকারে সমগ্র জগত পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আর শৈশবের দোলনায় আমার রোজা পালনের ব্যাপারটি তো প্রসিদ্ধিই লাভ করেছে"। (তারগীবুল মানাজির)।

বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা

হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী (রাদিঃ)-এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভ হয় একটি মক্তবে। আগ্রা নিবাসী আল্লামা মোহাম্মদ ছাদেক আগ্রাভী স্ব-রচিত গ্রন্থে গাউসে পাকের মক্তবী জীবনের প্রথম দিনের ঘটনা এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেনঃ

"হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাদিঃ) কে বিদ্যা-শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথম দিন মক্তবে পাঠানো হলে একদল ফেরেস্তা তাঁকে বেষ্টন করে মক্তবে পৌছিয়ে দেন। মক্তবে ছাত্রদের ভীড়ে বসার কোন খালি জায়গা ছিলনা। হঠাৎ করে সকলে একটি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলো— تَفَسَّحُوْا لِوَلِىِّ اللهِ "তোমরা আল্লাহর অলীর জন্য স্থান প্রশস্ত করে দাও"। এ আওয়াজ শুনে সকল ছাত্র হুজুরে গাউছে পাকের জন্য জায়গা করে দিল। ওস্তাদজী তাঁকে একেবারে প্রাথমিক স্তরের ছাত্র মনে করে আউযু ও বিস্‌মিল্লাহ সবক দান করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়! হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) আউযু, বিস্‌মিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলিফ-লাম-মীম থেকে শুরু করে ১৮ পারা, মতান্তরে ১৫ পারা কুরআন মজিদ মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। ওস্তাদজী জিজ্ঞাস করলেনঃ কেমন করে এই ১৮ পারা মুখস্ত করেছ? হযরত গাউসুল আ'জম বললেনঃ "মায়ের মুখে শুনে শুনে মুখস্ত হয়ে গেছে"। আউলিয়ায়ে কেরামগণ বলেনঃ মাতৃগর্ভে থাক্‌তেই এই কারামত ঘটেছিল। কেননা, উম্মুল খায়ের ফাতেমা ছিলেন ১৮ পারার হাফেজা। মাতৃগর্ভ হতে তাঁর পবিত্র আত্মা বাঘের ছুরত ধারন করে একবার এক নষ্ট চরিত্রের ভিক্ষুককে হত্যা করেছিল— যা তিনি নিজেই পরবর্তীকালে তাঁর মাকে বলেছিলেন। তাঁর পক্ষে মাতৃগর্ভে ১৮ পারা হেফজ করা তো এমন কিছু কঠিন কাজ

নয়। কারামত তো কারামতই। মানুষের অর্জিত গুন নয় এটি। এটি হচ্ছে খোদা প্রদত্ত অলৌকিক শক্তি। এতে সন্দেহের কিছু নেই। সন্দেহ বাদীরা পরের বেলায় দলীল চায়- কিন্তু নিজেদের বেলায় স্বপ্ন দিয়েই চালিয়ে দেয়। তাদের লিখিত "আরওয়াহে ছালাছা" বা "তিন পবিত্র রূহ" নামক গ্রন্থে তাদের তিনজন শীর্ষস্থানীয় দেওবন্দী মুরুব্বীর স্বপ্নযোগের অসংখ্য কারামত তারা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। কিন্তু গাউসুল আ'জমের কারামতে তারাই সন্দেহ করে বেশী।

উক্ত মক্তবেই আর এক দিনের ঘটনা। একজন দরবেশ একদিন মক্তবে এসে গাউসুল আজমের আগমন কালে একটি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন—"তোমরা আল্লাহর অলীর জন্য স্থান প্রশস্ত করে দাও"। এ আওয়াজ শুনে তিনি বললেন ঃ

سَيَكُوْنُ لَهٗ شَانٌ عَظِيْمٌ + يَعْظُمُ فَلَا يُمْنَعُ

وَيَتَمَكَّنُ فَلَا يُحْجَبُ + وَيُقَرَّبُ فَلَا يُمْسَكُ

"এই বালক কালক্রমে অতিশয় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। সে বিনা বাধায় সম্মানীত হবে। বিনা বাধায় ও বিনা প্রতিবন্ধকতায় সে মিলন লাভ করবে এবং বিনা ধ্যানেই সে সান্নিধ্য লাভ করবে"। হযরত গাউসুল আ'জম (রাদিঃ) বলেনঃ দীর্ঘ ৪০ বৎসর পর তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে বুঝতে পারলাম— তিনি একজন আব্দাল শ্রেণীর অলী ছিলেন।

উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাগদাদ যাত্রা

বাল্যকালেই হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাদিঃ)-এর পিতা ইনতিকাল করেন। ছেলের উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ৪০টি দীনার স্ত্রীর কাছে রেখে যান। পিতার ইনতিকালে হযরত গাউসুল আ'জম (রাদিঃ) কিছুদিন সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হন। একদিন তিনি একটি গাভী নিয়ে মাঠে যাচ্ছিলেন। গাভীটি পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ করে মানুষের মত আওয়াজ করে বলে উঠলোঃ

يَا عَبْدَ اْلقَادِرِ مَا لِهٰذَا خُلِقْتَ وَلَا بِهٰذَا اُمِرْتَ

— "হে আবদুল কাদের! এ কাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়নি এবং এ জন্য তোমাকে আদেশও করা হয়নি" (ছাওয়ানেহে উমরী হযরত গাউসুল আ'জম)। গাভীর মুখে এ সতর্কবাণী শুনে হযরত বড়পীর সাহেবের মন উতলা হয়ে উঠে। তিনি আরও গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। মা সানন্দচিত্তে তাতে সম্মতি দেন। মায়ের দোয়া নিয়ে তিনি বাগদাদে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। এ সময়

জিলান শহর থেকে একটি বাণিজ্য কাফেলা বাগদাদ যাচ্ছিল। এ কাফেলার সাথেই তিনি বাগদাদ গমনের জন্য মনস্থ করলেন। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮ বৎসর এবং বৃদ্ধা মায়ের বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর। বৃদ্ধা জননী নিজের ভবিষ্যত খেয়াল না করেই সন্তানের মঙ্গল কামনা করে স্বামীর সঞ্চিত ৪০টি দীনার গাউসে পাকের জামার বগলের নীচে সেলাই করে দেন খরচের জন্য। বিদায়ের সময় সন্তানকে একটি উপদেশ দেন— যেন সর্বদা সত্য কথা বলা হয়। কেননা, সত্যবাদিতাই মানুষকে সর্ব পাপ ও বিপদ থেকে রক্ষা করে।

ডাকাত দলের কবলে

হযরত গাউসুল আ'জম (রাদিঃ) শেষ বারের মত বৃদ্ধা জননীকে সালাম ও কদমবুসী করে বাগদাদের পথে বাণিজ্য কাফেলার সাথে রওয়ানা দিলেন। বাগদাদ ছিল তখনকার দিনের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুনী শিক্ষকগণ বাগদাদে এসে ভীড় জমিয়েছিলেন। নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। বড়পীর সাহেব যখন বাগদাদে আগমন করেন- তখন আব্বাসীয় খলিফা ছিলেন আল-মুক্বতাদী বি-আমরিল্লাহ। সন ছিল ৪৮৮ হিজরী।

হযরত বড়পীর সাহেব (রাদিঃ) স্বয়ং বলেনঃ "মায়ের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমি বাণিজ্য কাফেলার সাথে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করলাম। হামাদান ছেড়ে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হতেই এক বিপদ এসে উপস্থিত হলো। অশ্বারোহী ৬০ জন ডাকাতের একটি দল আমাদের কাফেলা আক্রমণ করলো। যাত্রীদের মাল-সামানা ও টাকা-পয়সা যা কিছু ছিল, ডাকাতরা সব লুট করে নিল। তাদের একজন এসে তাচ্ছিল্যের সাথে আমাকে জিজ্ঞেস করলো— ওহে বালক! তোমার নিকট কিছু আছে কি? আমি মায়ের উপদেশ মোতাবেক বল্লাম— হাঁ, আমার নিকট চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। একথা শুনে তার বিশ্বাস হচ্ছিলনা। সে আমাকে ধরে তাদের সর্দারের কাছে নিয়ে গেল। ডাকাত সর্দার অতি কর্কশ স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলো— তোমার নিকট কি আছে? আমি বল্লাম- চল্লিশটি দীনার। আমার আম্মাজান এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো আমার জামার বগলের নীচে সেলাই করে দিয়েছেন। একথা শুনে সর্দারের মনে তাবান্তর দেখা দিল। সে বললো— তুমি কেন দীনারের কথা প্রকাশ করলে? অন্যরা তো অস্বীকার করেছে। তুমি না বললে আমরা সন্দেহ করতাম না। আমি বল্লাম- মা বলেছেন, সত্য কথায় মুক্তি পাওয়া যায়। মায়ের পদতলে বেহেস্ত। তাই আমি মায়ের কথা রক্ষা করেছি"।

গাউসে পাকের একথা শুনে ডাকাত সর্দার আহমদ বদভী কেঁদে ফেললো। সে বলতে লাগলো— হায়! এই বালক মায়ের ওয়াদা ভঙ্গ করেনি। আমরা তো খোদার ওয়াদা ভঙ্গ করে ডাকাতি করছি। আল্লাহর কত বান্দার ধন প্রান আমরা নষ্ট করছি। এ কথা বলেই সে গাউসে পাকের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো এবং তার অনুসারীসহ

সকলে তৌবা করলো। কাফেলার লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত দিল। জীবনে আর কোন দিন আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করলো। বাহজাতুল আসরার গ্রন্থে হযরত আবুল হাসান নূরুদ্দীন (রহঃ) বলেনঃ এই ডাকাত দল হযরত গাউসে পাকের হাতে তৌবা করে রিয়াজতে মনোনিবেশ করেন এবং আল্লাহর অলী হয়ে যান। গাউসে পাকের সততা ও নেগাহে করমে তাদের জীবনের চাকা ঘুরে যায়। সত্যিই কোন সাধক বলেছেনঃ

নেগাহে অলী মেঁ ইয়ে তাছির দেখি,
বদলতী হাজারোঁ কি তাক্‌দীর দেখি।

অর্থাৎ— "আল্লাহর অলীদের নেক নজরের মধ্যে এমন তাছির রয়েছে যে, এক মূহুর্তে হাজারো তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যায়"। হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী মকতুবাত শরীফে বলেছেনঃ "যে তাকদীর খোদার কাছে পরিবর্তনযোগ্য, এমন তাকদীর পরিবর্তনে আল্লাহ পাক হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানীকে (রাদিঃ) হস্তক্ষেপ করার অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছেন" (মকতুব নং ২১৭, ১ম খন্ড ২২৪ পৃষ্ঠা)। ইহারাই গাউসে পাকের প্রথম মুরীদ বলে গণ্য। ৬০ জন ডাকাতকে এক নজরে হেদায়াত করে তিনি হেদায়াতের প্রথম দায়িত্ব পালন করেন ছাত্রাবস্থায় মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে। আমরা কেউ কলেমা চোর, কেউ নামাজ চোর, কেউ পরের হক্বের চোর। আমরা গাউসে পাকের নেগাহে করমের প্রত্যাশী।

যেই নজরে চোরকে তুমি, দিলে কুতুব বানাইয়া,
সেই নজরে কর দয়া, ওগো দয়াল গাউছিয়া; –
সকলেরে দাও গো তুমি— তোমার সেই নজরখানী
তোমারি নামের গুনে আগুন হয়ে যায় পানি।

মাদ্রাসা নেজামিয়াতে অধ্যয়ন ঃ ইলমে জাহের ও ইল্‌মে বাতেনের শিক্ষা লাভ

হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ) ৪০০ মাইল পথ অতিক্রম করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ৪৮৮ হিজরীতে ১৮ বৎসর বয়সে বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত নেজামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তথায় ৮ বৎসরে কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাফসীর, হাদিস, ফেকাহ, তাসাউফ, আরবী সাহিত্য ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি লাভ করেন। সে সময় ৪৮৮ হিজরীতে গাউসে পাকের সম বয়সী আব্বাসী খলিফা আল মোস্তাজহের বিল্লাহ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহন করেন। এবং পূর্ববর্তী খলিফা আল মোক্‌তাদী বি-আমরিল্লাহ ইনতিকাল করেন। পরবর্তী খলিফা আল মুসতানজিদ ও আল মোক্‌তাফী গাউসে পাকের ভক্ত ছিলেন।

হযরত গাউসুল আজম মাদ্রাসা নেজামিয়াতে যে সব ওস্তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা লাভ করেন-তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিক হাম্মাদ ইবনে মুসলিম, মোহাদ্দেস মোহাম্মদ ইবনে হাসান বাকেল্লানী, ফকিহ কাজী আবু সাঈদ মোবারক মাখজুমী ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও দরবেশ। তন্মধ্যে কাজী আবু সাঈদ মাখজুমী ছিলেন শ্রেষ্ঠ অলী। হযরত গাউসে পাক (রাঃ) তাঁর কাছেই বাইয়াত হন এবং তরিকত জগতে তাঁর খলিফা নিযুক্ত হয়ে অলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্য লাভ করেন। গাউসে পাকের উপর তাঁর স্নেহ ও প্রভাব ছিল অপরিসীম।

পঁচিশ বৎসর বয়সে হযরত গাউসুল আজম (রাঃ) শরীয়তের ১৩ টি শাখায় ও তরিকতের বিভিন্ন মাকামের যাবতীয় বিদ্যা সমাপ্ত করেন। তারপরের পঁচিশ বৎসর কঠোর রেয়াজতে বনে জঙ্গলে, বিরান মরুময় বিয়াবানে ঘুরে বেড়ান। ৫১৩ হিজরীতে তাঁর পীর ও মুর্শেদ হযরত আবু সাঈদ মাখজুমী (রহঃ) ইনতিকাল করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "মাদ্রাসায়ে বাবুল আ'জাজ"-এর পরিচালনাভার হযরত গাউসুল আ'জমের উপর অর্পিত হয়। ৫২১ হিজরীতে ৫০ বছর বয়সে হযরত গাউসুল আ'জম সংসারী হন রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নির্দেশে।

ওয়াজ নসিহত শুরু

সে বৎসরই তিনি ওয়াজ নসিহত ও হেদায়াতের কাজের জন্য নির্দেশিত হন। রাসুল করিম (দঃ) ঐ বৎসর ১৬ই শাওয়াল রাত্রে স্বপ্নে হযরত গাউসে পাককে ওয়াজ নসিহত করার নির্দেশ দেন। হযরত গাউসে পাক পারশ্যবাসী বলে আরবী উচ্চারনে আরবদের সমকক্ষ ছিলেন না বলে জানালে নবী করিম (দঃ) স্বপ্নে সামান্য থুথু মোবারক তাঁর জিহবায় ঢেলে দেন। এই থুথু মোবারকের বরকতে গাউসে পাকের জবান খুলে যায়। পরদিন থেকে তিনি ওয়াজ নসিহত শুরু করেন। তাঁর ভাষার লালিত্বে, বাচন ভঙ্গিতে এবং ভাবের গভীরতায় ওয়াজ মজলিশে দু'চার জন করে লোক বেহুঁশ হয়ে মারা যেত। হুজুরের (দঃ) দানের বরকতে তাঁর ওয়াজ মজলিশে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হতো। প্রায় চারশত পন্ডিত ব্যক্তি তাঁর ওয়াজ লিখে রাখতেন। এভাবে জগতময় গাউসে পাকের নাম ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তাঁর একটি কারামত প্রকাশ হয়ে পড়ে। মজলিশের সবচেয়ে পিছনের লোকটিও সামনের লোকের মত সমান আওয়াজে গাউসে পাকের ওয়াজ শুনতেন। এমনকি বাগদাদ থেকে ৫০০ কিঃ মিঃ দূরের শহর মোসেলে বসেও অনেক লোক বাগদাদ শরীফে গাউসে পাকের প্রদত্ত ওয়াজ শুনতেন। বর্তমান যুগে ইথারের তরঙ্গের মাধ্যমে মানুষের মুখের কথা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছে। ঐ যুগে গাউসে পাকের বাণী বহন করে নিয়ে যেতো ইথারের তরঙ্গরাজী। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ পাকই আপন অলীদেরকে এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করে থাকেন। ইহা গাউসে পাকের খাস কারামত। এ প্রসঙ্গে মোসেল নিবাসী বিখ্যাত পীর ও গাউসে পাকের মুরীদ হযরত আদি বিন মুসাফির (রহঃ)-এর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। আদি বিন মুসাফির (রহঃ) বাগদাদ শরীফে হযরত গাউসে পাকের ওয়াজ মজলিশে সব সময়

উপস্থিত থাকতেন এবং ওয়াজ শুনতেন। গাউসে পাক শুক্র, শনি ও রবি এই তিন দিন তিন জায়গায় ওয়াজ করতেন। একদিন আদি বিন মুসাফির (রহঃ) আরজ করলেন— ইয়া গাউসে পাক! আমার মন আপনাকে ছেড়ে যেতে চায় না। তবুও দেশে যেতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আপনার এই মূল্যবান ওয়াজ থেকে আমি বঞ্চিত হবো। গাউসে পাক বললেনঃ "তুমি আমার ওয়াজের নির্ধারিত সময়ে মোসেল বাসীদের নিয়ে কোন পাহাড়ের পাদদেশে একটি বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে সকলকে নিয়ে বসে যাবে। ইন্‌শা আল্লাহ তোমরা সকলেই সেখানে বসে আমার ওয়াজ নসিহত শুনতে পাবে"।

উপদেশ মোতাবেক আদি বিন মুসাফির (রহঃ) তাই করলেন। তিনি বলেনঃ আমাদের মনে হতো যেন আমাদের মাথার উপরে মেঘের মিনারে বসে হযরত গাউসে পাক বক্তৃতা দিচ্ছেন, আর আমরা শুনছি। এখানে দেখা যায়, বার্তা প্রেরক একজন অলী এবং বার্তা ধারকও আর একজন অলী। আর বার্তা বাহক হচ্ছে আল্লাহর ইথার তরঙ্গ। আল্লাহ আপন প্রিয় ও মাহবুব বান্দার খেদমতে এমনি ভাবেই তার সৃষ্টি জগতকে বশীভূত করে দেন। হযরত শেখ সাদীর একটি বয়েতের অনুবাদ খুবই হৃদয়গ্রাহী।

— "এক সিজদা কর যদি মহা প্রভূর দ্বারে,
নত হবে শত শীর তব পদতলে।"

পাঠ্যাবস্থায় এবং পরবর্তীকালে কঠোর সাধনা ও অগ্নী পরীক্ষা

ছাত্র জীবনে গাউসুল আজম কত কষ্ট করেছেন— তা বর্ণনাতীত। চল্লিশটি দীনার অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। বাগদাদে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গাউসে পাক মহাবিপদে পড়েন। তাঁর পবিত্র জবানে সে ঘটনা শুনা যাক। গাউসে পাক বলেনঃ

"একাধিক্রমে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোন হালাল বস্তুর যোগাড় করতে পারিনি। হালাল বস্তু যোগাড় করার মানসে একদিন বাগদাদের অদূরে পারশ্য সম্রাটের ঐতিহাসিক প্রাসাদের নিকট গিয়ে দেখি, সেখানে আরও সত্তরজন অলি-আল্লাহ জীবিকার খোঁজ করছেন। তাঁদের সাথে খাদ্যের প্রতিযোগিতা করা সমীচীন নয় মনে করে ফিরে আসি। বাগদাদে জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি কিছু টাকা আমাকে দিয়ে বললেন— 'তোমার মা তোমার জন্য এই টাকা আমার মারফত পাঠিয়েছেন। আমি নিজের জন্য সামান্য কিছু রেখে বাকী টাকা (স্বর্ণমুদ্রা) ঐ সত্তরজন অলীর মধ্যে বন্টন করে দিয়ে আসি।

আত্মত্যাগের এরূপ বহু দৃষ্টান্ত গাউসে পাকের জীবনে পাওয়া যায়। একবার বাগদাদে দুর্ভিক্ষের সময় গাউসুল আ'জম (রাঃ) মানুষের ফেলে দেয়া খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধানে নদীর কিনারায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি একই উদ্দেশ্যে ক্ষুধার জ্বালায় অনেক লোককে তাঁর আগে আগে যেতে দেখে ফিরে আসলেন। খাদ্যের সন্ধানে অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। আর একবারের ঘটনা। তিনি

ক্ষুধার জ্বালায় একটি জঙ্গলে গিয়ে গাছ থেকে পাকা ফল পড়ার অপেক্ষা করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আরও কিছু লোক একই উদ্দেশ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচন্ড ক্ষুধা সত্বেও তিনি তাঁদের ক্ষতির আশংকায় ফিরে আসলেন। অন্যের হক্বের প্রতি প্রাধান্য প্রদর্শনের এই মনোবৃত্তি কয়জনের মধ্যে পাওয়া যাবে? বিপদে ধৈর্য ধারন করা এবং কৃচ্ছতা সাধন করার এই দৃষ্টান্ত খুবই বিরল ঘটনা।

অবশেষে গাউসে পাক ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে রায়হানা নামক বাজারের মসজিদে গিয়ে এক কোণায় বসে পড়লেন। এমন অবস্থায় এক যুবক কিছু রুটী ও গোস্ত এনে খেতে বস্‌লো। গাউসে পাকের ক্ষুধা তখন দ্বিগুন বেড়ে গেল। গাউসে পাকের এই বেহাল অবস্থা দেখে তখন ঐ যুবক জানতে চাইল— আবদুল কাদের নামের কোন ছাত্রকে তিনি চিনেন কিনা? গাউসে পাক বললেন— আমার নামই আবদুল কাদের। ঐ যুবক বললো- ভাই! আপনার আম্মাজান ৮টি দীনার আপনাকে দেয়ার জন্য আমার কাছে দিয়েছিলেন। বহুদিন আপনার অনুসন্ধান করে না পেয়ে সেই দীনার থেকে আজ কিছু রুটী ও গোস্ত খরিদ করে এইমাত্র খেতে বসেছি। আসলে এই রুটী ও গোস্তের মালিক আমি নই- বরং আপনি। নিন! আপনি আপনার টাকায় ক্রয়কৃত খানা গ্রহণ করুন। গাউসে পাক খানা খেলেন এবং খোদার শুকরিয়া আদায় করলেন। উক্ত যুবককে কিছু টাকা দিয়ে তিনি বিদায় করলেন। এটাকেই বলা হয় সৌজন্যবোধ। আরও অনেক ঘটনা আছে। ছাত্র বন্ধুদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট মনে করি। দ্বীনের এলম শিক্ষা করতে হলে গাউসে পাক থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। গাউসে পাক বলেনঃ "আমি কষ্ট করে এলেম শিখে কুতুব হয়েছি— (কসিদা গাউসিয়া)। তিনি কাছিদা গাউছিয়ায় আরো বলেনঃ "ওয়া ওয়াল্লানী আলাল আক্‌তাবে জাম্‌আন, ফা-হুক্‌মী নাফিজুন ফি কুল্লি হালী"। অর্থাৎঃ "আল্লাহ পাক আমাকে সকল কুতুবের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। আমার আদেশ সর্বাবস্থায়ই কার্যকর থাকবে"। মূল কথা— হযরত বড়পীর আবাদুল কাদের জিলানী (রাদিঃ) সর্বযুগের শ্রেষ্ঠতম অলী এবং সকল অলীদের উপর তাঁর কর্তৃত্ব বহাল থাকবে। হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ) কে মহিউদ্দীন মুহাম্মদ বিন-নাজজার তাঁর ইতিহাসে যুগের শ্রেষ্ঠতম ইমাম বলে উল্লেখ করে বলেছেন— ফিক্‌হ ও হাদীসে গাউসে পাকের জ্ঞান ছিল অসাধারন। তিনি নির্জন স্থানে পড়াশুনা করতে ভালবাসতেন। অধিকাংশ সময় তাইগ্রীস (দজলা) নদীর তীরে, বনে জঙ্গলে, কখনও বা নির্জন প্রান্তরে বসে বসে ফিক্বাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন।

আধ্যাত্মিক কঠোর সাধনা

নবী করিম (দঃ) হাদীসে বলেছেনঃ "শত্রুর সাথে জেহাদ করা হলো ছোট জেহাদ, কিন্তু নাফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করা হচ্ছে বড় জেহাদ"। ষড়রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) হচ্ছে নাফস। একে নাফসে আম্মারা বা কু-প্রবৃত্তি বলা হয়। এই রিপুগুলোকে নিয়ন্ত্রণ বা আজ্ঞাধীন করার জন্য যে সাধনা করা হয়, তাই তরিকতের

সাধনা। এজন্য একজন পীর বা মুর্শিদের শরনাপন্ন হওয়া প্রয়োজ[illegible]দ্ধি লাভ করা যায় না। এজন্যই কোরআন মজিদে বার বার অলীদের স[illegible] গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঈমান ও আমল ঠিক করার পর মুর্শিদ[illegible] কোরআনের নির্দেশ। "ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াছিলা" এবং "ওয়া[illegible] ছাদেকীন" দুটি আয়াতে পীরের নিকট বাইয়াত হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত ক[illegible]ছে (তাফসীরে রুহুল বয়ান)। হযরত গাউছে পাক (রাঃ) মাদারজাদ অলী হওয়া সত্বেও হযরত আবু ছাঈদ মাখ্‌যুমী (রহঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে কঠোর সাধনার মাধ্যমে গাউছিয়তে উজমা (গাউসুল আ'জম) মর্যাদা লাভ করেন। এই বাইয়াত রাসুল করিম (দঃ)-এর সুন্নাত। 'ইরগামুল মুরিদীন' নামক আরবী গ্রন্থে লিখিত আছেঃ একজন জীবিত মুর্শিদের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করা সুন্নাত। হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ) পীরের হাতে বাইয়াত হওয়ার পর কঠোর রিয়াজাতে মগ্ন হয়ে পড়েন। যখন উপযুক্ত সময় হলো, তখন তাঁর পীর-মুর্শিদ হযরত আবু ছাঈদ মাখ্‌যুমী (রহঃ) তাঁকে খেরকা (খেলাফতের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ পোষাক) পরিধান করিয়ে দেন এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। হযরত আবু ছাঈদ মাখ্‌যুমী (রহঃ) ৫১৩ হিজরীর ১লা মুহররম ওফাত প্রাপ্ত হন। কিভাবে তিনি খেলাফাত লাভ করেন তাঁর বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন। হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ) বলেনঃ "একদিন আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছিল। এমন সময় আমার পীর হযরত আবু ছাঈদ মাখ্‌যুমী (রহঃ) এসে বললেন— তুমি আমার বাড়ী চলো। একথা বলেই তিনি নিজ বাড়ীতে চলে গেলেন। কিন্তু আমার লজ্জাবোধ হওয়াতে আমি ইতস্ততঃ করতেছিলাম। এমন সময় খিজির আলআইহিস সালাম এসে আমাকে যাওয়ার জন্য তাকিদ করলেন। আমি পীরের বাড়ী গিয়ে দেখি— তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে বললেনঃ আবদুল কাদের! আমার বলাই কি যথেষ্ঠ ছিল না? আবার খিজির আলাইহিস সালামের বলার প্রয়োজন হলো! একথা বলেই তিনি আমার জন্য খাবার নিয়ে আসলেন এবং নিজ হাতে আমাকে খাওয়াতে লাগলেন। আমার শায়খের হাতের প্রতিটি লোকমায় আমার অন্তরে নূর ভরে যেতো। এরপর তিনি আমাকে খেরকা পরিধান করিয়ে দেন"। উক্ত খেরকা পরিধান করার পর হযরত গাউসুল আ'জমের উপর আল্লাহ তায়ালার নানাবিধ রহমত, বরকত ও তাজাল্লী অধিক পরিমাণে প্রকাশ পেতে লাগলো।

পীরের মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে

হযরত আবু ছাঈদ মাখ্‌যুমী (রহঃ) বাগদাদ শরীফের "বাবুশ শাইখ" নামক স্থানে 'বাবুল আ'যাজ' নামে একটি উচ্চমানের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনতিকালের পূর্বে তিনি উক্ত মাদ্রাসার দায়িত্ব ভার গাউসুল আ'জমের উপর অর্পণ করে যান। ৫১৩ হিজরী হতে আরম্ভ করে ৫৬১ হিজরীতে ইন্‌তিকাল সময় পর্যন্ত গাউসে পাক উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে অসংখ্য তালেবে এলেম

[illegible] নিকট কোরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, নাহু, ছরফ, আরবী [illegible]উফ শিক্ষা করে যুগ বরেণ্য আলেম ও অলীতে পরিণত হন। উক্ত [illegible]নেই বর্তমানে গাউসে পাকের মাযার শরীফ অবস্থিত। পার্শ্বেই রয়েছে এক [illegible] লাইব্রেরী। হাজার হাজার কিতাব উক্ত লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। ১৯৮২ ইং [illegible], ১৯৮৪ সালে ও ১৯৮৫ সালে বাগদাদ শরীফ জিয়ারত কালে অধীন লেখক উক্ত লাইব্রেরী পরিদর্শন করেছি। উক্ত লাইব্রেরীতে হযরত গাউসে পাকের স্ব-হস্ত লিখিত অনেক কিতাবের পান্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। গাউসে পাকের অসংখ্য শাগরিদদের মধ্যে কাজী আবদুল মালেক, শায়খ ইব্রাহীম, শায়খ ফকিহ আবুল ফাতাহ্‌, শায়ক তাল্‌হা প্রমুখ খুবই প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন।

ধর্মীয় সংস্কারকরূপে

হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী (রাদিঃ) শুধু গাউসুল আ'জম ও আধ্যাত্মিক সাধকই ছিলেন না। তিনি হিজরী ষষ্ঠ শতকের মুজাদ্দিদ বা ধর্মীয় সংস্কারকও ছিলেন। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِأَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا (اَبُو دَاؤُدَ وَمِشْكوٰة)

অর্থাৎঃ "আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের জন্য প্রতি শতকের শুরুতে এমন ব্যক্তিকে/ব্যক্তিদেরকে প্রেরণ করেন, যিনি/যারা তাদের জন্য ধর্মীয় সংস্কারের ভূমিকা পালন করবেন"। (আবু দাউদ ও মিশকাত)।

উক্ত হাদীস অনুযায়ী হিজরী প্রথম শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। দ্বিতীয় শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ)। তৃতীয় শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)। চতুর্থ শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন ইমাম গাজজালী (রহঃ)। ষষ্ঠ শতকের মুজাদ্দিদ হলেন হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)। সপ্তম শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাঃ)। অষ্টম হিজরীর মুজাদ্দিদ ছিলেন হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহঃ) এবং ইমাম তকিউদ্দীন সুবকী। একাদশ শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন হযরত আহমদ সিরহিন্দী (রাঃ), যাকে মুজাদ্দিদে আলফে সানী বা দ্বিতীয় সহস্রের প্রথম মুজাদ্দিদও বলা হয়। চতুর্দশ শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আহমদ রেজা খান ফাজেলে বেরেলভী (রাঃ)। পঞ্চদশ শতকের (বর্তমান হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ এখনও নির্ধারিত হয়নি। দেওবন্দী গ্রুপের মুজাদ্দিদ দাবী করা হয় আশ্রাফ আলী খানবীকে (সূত্রঃ মুজাদ্দিদ— মাওঃ আজিজুর রহমান নেছারা বাদী)।

বিভিন্ন গ্রন্থে মুজাদ্দিদের যে সব বৈশিষ্ট্য লিখা আছে, তার মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট হলো— এক শতাব্দীর শেষাংশে তিনি পয়দা হবেন এবং পরবর্তী শতকের প্রথমাংশে তাঁর সংস্কার কাজের প্রকাশ হবে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হলো— উক্ত শতকের উলামাগণ তাঁর ইল্‌ম ও আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে হার মানবেন (মজমউল ফাতাওয়া— আব্দুল হাই লখ্‌নভী)।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ) উমাইয়া খলিফা হয়েও যেসব সংস্কারমূলক কাজ করেছেন– তার মধ্যে পূর্ববর্তী উমাইয়া শাসকদের শরীয়ত বিরোধী শাসনের পুনঃ সংস্কার, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং শিয়াদের বানোয়াট জাল হাদীসসমূহ চিহ্নিতকরণ। ইমাম গাজজালী (রহঃ)-এর সংস্কারমূলক কাজ ছিল শিরক পূর্ণ গ্রীক দর্শন খন্ডন এবং ইসলামী আক্বিদা ও দর্শনকে গ্রীকদর্শন থেকে মুক্তকরণ। হযরত গাউসে পাক (রাদিঃ)-এর সংস্কারমূলক কাজ ছিল দ্বিমুখী– শরীয়ত ও তরিকত তথা ইসলামকে নূতন জীবন দান। এজন্যাই তাঁর লকব বা উপাধী ছিল মহিউদ্দীন বা দ্বীনকে নূতন জীবন দানকারী। বিগত শতকগুলোতে ইসলামের নামে খারেজী, শিয়া, মোতাজেলা ও শিয়া কারামতা সম্প্রদায়গুলো ইসলামে যে সব বাতিল আক্বিদা সৃষ্টি করেছিল— হযরত গাউসে পাক (রাঃ) সে সব বাতিল আক্বিদা খন্ডন করে শ্বাশ্বত ছুন্নী আক্বিদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। বাতিল পন্থী বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের কুফরী আক্বিদা খন্ডন করে গাউসে পাক তাঁর রচিত গুনিয়াতুত তালেবীন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ৭২ ফের্কার নাম এবং আক্বিদা সবিস্তারে উক্ত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনি গালী শিয়াদেরকে (চরমপন্থী শিয়া) ইহুদীর ন্যায় কাফের বলে সনাক্ত করেছেন। একারণেই শিয়ারা হযরত গাউসে পাককে নবী বংশের তালিকা থেকেও বাদ দিয়েছে। তিনি আহলে বাইতসহ সকল সাহাবীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রাঃ)-এর মূল সংস্কার ছিল সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত দ্বীনে এলাহী খন্ডন এবং শিয়া মতবাদের ধ্বংস সাধন। তরিকতের মধ্যে যেসব মূর্খ সুফীগণ শরীয়ত বিবর্জিত তরিকত চর্চা করতো, তার সংশোধন করে শরীয়ত ভিত্তিক তরিকত চালু করণ ছিল তাঁর অবদান। দ্বাদশ ও এয়োদশ শতকে আরবে ও আজমে এক নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তাদের নাম ওহাবী সম্প্রদায়। এর নেতা ছিল নজদের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী। এই সম্প্রদায় কালক্রমে ভারতেও বিস্তৃতি লাভ করে। এদের আক্বিদা হলো— নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারক জিয়ারতে যাওয়া শিরক, কোন নবী অলীর উছিলা ধরা শিরক, রাসুল (দঃ) মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন– নাউজুবিল্লাহ। তাদের মতে মিলাদ কেয়াম, উরস-জিয়ারত, ফাতেহাখানী আজানের মুনাজাতে হাত উত্তোলন, শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে ক্বদর পালন ও ঈদে মিলাদুন্নবী পালন ইত্যাদি হারাম ও বিদ্‌আত। তাদের এই কুফরী ও শিরিকী আক্বিদা খন্ডন করেছেন চৌদ্দশতকের মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান

বেরেলভী (রাঃ)। দেওবন্দী সম্প্রদায় ওহাবী আক্বিদার ধারক ও প্রচারক। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত বাতিল আক্বিদার উদ্ভব হতে থাকবে আর প্রতি শতকে মোজাদ্দেদ এসে তার সংস্কার করবেন।

মহিউদ্দীন উপাধী লাভ

৫১১ হিজরীর কোন এক শুক্রবার দিন হযরত গাউসে পাক (রাঃ) নগ্নপদে বাগদাদ শহরের দিকে আসছিলেন। এমন সময় পথিপার্শ্বে একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে তিনি শায়িত অবস্থায় দেখতে পেলেন। উক্ত বৃদ্ধ সালাম দিয়ে হযরত গাউসে পাককে বললো— 'আমাকে ধরে তুলুন— আমি শক্তিহীন'। হযরত বড়পীর সাহেব তাকে তুলে বসালেন। তখন উক্ত জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ ধীরে ধীরে জরামুক্ত হতে লাগলো এবং বললো— "আমি ইসলাম ধর্ম, লোকের কুসংস্কারে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। আপনার সাহায্যে আমি নব জীবন লাভ করলাম"। এ ঘটনার পর হযরত গাউসে পাক বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে কোন এক জামে মসজিদে জুমা পড়ার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতেই লোকেরা তাঁকে "মহিউদ্দীন" নামে সম্বোধন করতে লাগলো। তখন থেকেই তাঁর এগার নামের মধ্যে এক নাম হয় "মহিউদ্দীন" বা দ্বীনের নব জীবন দানকারী। সত্যিই! তাঁর সংস্কারমূলক কাজই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৫২১ হিজরী থেকে ৫৬১ হিজরী পর্যন্ত ৪০ বৎসরের জীবন

হযরত গাউসে পাক (রাঃ) শিশুকাল থেকে ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত জাহেরী বাতেনী বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। এরপর ২৫ বৎসর পর্যন্ত ইবাদত, রিয়াজত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় অতিবাহিত করেন। ৫০ বৎসর বয়সের সময় তিনি নবী করিম (দঃ)-এর নির্দেশে সংসারী জীবন শুরু করেন। তাঁর চার বিবির ঘরে মোট ৪৯ জন ছেলে-মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ২৭ জন ছেলে এবং ২২ জন মেয়ে সন্তান। পঞ্চাশতম সন্তানকে তিনি রুহানীভাবে জনৈক নিঃসন্তান 'আরবী' নামক ব্যক্তিকে দান করে দেন এবং নাম রেখে দেন মহিউদ্দীন। ঐ ব্যক্তির সন্তান হলে হুজুরের নির্দেশ মোতাবেক নাম রাখা হয় মহিউদ্দীন ইবনে আরবী। এই মহিউদ্দীন ইবনে আরবী (রহঃ) সে যুগের শ্রেষ্ঠ অলী হয়েছিলেন এবং ফানাফিল্লাহর মকাম লাভ করেছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম তাসাউফের উপর "ওয়াহ্দাতুল উজুদ" সম্পর্কীত কিতাব "ফতুহাতে মক্কিয়া" রচনা করেন। বাতিলপন্থী ইবনে তাইমিয়া তাঁকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিল। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ), মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) এবং হযরত মহিউদ্দীন ইবনে আরবী (রহঃ) ছিলেন "ওয়াহ্দাতুল উজুদ"— তত্ত্বের প্রবক্তা। হযরত গাউসে পাকের ছেলে সন্তানগণের মধ্যে কয়েকজন তরিকত জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে শায়খ সৈয়দ আবদুল ওয়াহহাব, শায়খ সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক, শায়খ সৈয়দ আবদুল আজীজ, শায়খ সৈয়দ ইছা, শায়খ সৈয়দ আবদুল জাব্বার, শায়খ সৈয়দ ইয়াহ্য়া, শায়খ সৈয়দ মুছা, শায়খ সৈয়দ আবদুল্লাহ, শায়খ সৈয়দ ইবরাহীম এবং শায়খ সৈয়দ মোহাম্মদ (রাদি আল্লাহু আনহুম) ছিলেন শরীয়ত ও তরিকতের এক একজন ইমাম সমতুল্য। প্রথম সন্তান হযরত সৈয়দ আবদুল ওয়াহাব (রহঃ) ছিলেন প্রথম গদীনশীন সাহেবজাদা। তিনি ৫২৩ হিজরীতে গাউসে পাকের ৫২ বৎসর বয়সে জন্ম গ্রহণ করেন।

৫১২ হিজরীতে হযরত গাউসে পাক "মাদ্রাসা বাবুল আজাজ" এ অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ৫৬১ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বৎসর শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকেন। ৫২১ হিজরীর ১৬ই শাওয়াল তারিখে তিনি রাসুলে পাক (দঃ)-এর স্বপ্নযোগে দীদার লাভ করেন এবং ওয়াজ, নসিহত ও হেদায়াতের নির্দেশ লাভ করেন। ১৭ই শাওয়াল যোহরের সময় তিনি নিজ মাদ্রাসায় প্রথম ওয়াজ মজলিশ কায়েম করেন। তাঁর আরবী বাচন ভঙ্গি ও ভাবের গাম্ভীর্য ও গভীরতার খ্যাতি বিদ্যুতের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে দেশ বিদেশের লোক ও পন্ডিত ব্যক্তিরা হুজুর গাউসে পাকের ওয়াজ শুনার জন্য বাগদাদে এসে ভীড় জামিয়েছিল। ৫২১ হিজরী হতে ৫৬১ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বৎসর পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে সপ্তাহে তিন দিন ওয়াজ করতেন। চার শত আলেম তাঁর মূল্যবান ভাষণ লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তাই গাউসে পাকের বাণীসমূহ একাধিক সূত্রে নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঐ সমস্ত সূত্র থেকে ৮৭ বৎসর পর ইমাম নূরুদ্দীন আবুল হাছান শাত্নুফী (মিশর) গাউসে পাকের বাণী ও কারামতসমূহ সংগ্রহ করে বাহ্জাতুল আসরার নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাই বর্ণনাকারীদের সনদ মাত্র দুই পরম্পর রাবীর মধ্যে সীমিত। হাদীস গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র ইমাম মালেকের মোয়াত্তাই সনদের ক্ষেত্রে বাহজাতুল আসরারের সনদের সাথে তুলনীয় হতে পারে। সুতরাং সনদ বা বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে বাহজাতুল আসারারের বর্ণনাকারীগণ নিঃসন্দেহ। হযরত গাউসে পাকের কারামত অধ্যায়ে বাহজাতুল আসরার ও নুজহাতুল খাতির গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হবে বেশী পরিমাণে। গাউসে পাক ৫২৮ হিজরী থেকে ৫৬১ হিজরী পর্য্যন্ত গুনিয়াতুত তালেবীন, ফতুহুল গায়ব, ছিররুল আসরার, কাছিদা গাউছিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন যা সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ছিররুল আছরার তো মা'রেফাতের রহস্যের খনি।

হুজুর গাউসুল আ'জমের পরিবার ও সন্তান-সন্ততি

হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) প্রথম জীবনে বিবাহের খেয়াল পরিত্যাগ করেছিলেন। কারণ, বিবাহিত জীবনে সংসারকে অনেক সময় দিতে হয়। এতে দ্বীনের কাজের সময় কমে যায়। কিন্তু বিবাহ করা সুন্নাত। তাই নবী করিম (দঃ) স্বপ্নে হুজুর গাউসে পাককে বিবাহ করার তাকিদ দেন। অবশেষে তিনি ৪টি বিবাহ করেন। পবিত্রা বিবিগণের নাম নিম্নরূপঃ

১। বিবি সাদেকা বিন্তে মুহাম্মদ শাফী (রহঃ)
২। বিবি মদিনা বিন্তে মীর মুহাম্মদ (রহঃ)

৩। বিবি মু'মেনা (রহঃ)
৪। বিবি মাহ্‌বুবা (রহঃ)

১। বিবি সাদেকার গর্ভে ৬ পুত্র ঃ যথা —

১। সৈয়দ আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ)
২। সৈয়দ আবদুল আজিজ (রহঃ)
৩। সৈয়দ আবদুল জাববার (রহঃ)
৪। সৈয়দ ছিরাজুদ্দীন (রহঃ)
৫। সৈয়দ সামছুদ্দীন (রহঃ)
৬। সৈয়দ তাজুদ্দীন (রহঃ)

২। বিবি মদিনার গর্ভে ৪ পুত্র ঃ যথা —

১। সৈয়দ আবদুর রাজজাক (রহঃ)
২। সৈয়দ ছায়েদ উদ্দীন (রহঃ)
৩। সৈয়দ শরফুদ্দীন (রহঃ)
৪। সৈয়দ ইছা (রহঃ)

৩। বিবি মু'মেনার গর্ভে ৭ পুত্র ঃ যথা —

১। সৈয়দ আবদুল্লাহ (রহঃ)
২। সৈয়দ ইব্রাহীম (রহঃ)
৩। সৈয়দ আবুল ফজল (রহঃ)
৪। সৈয়দ মুহাম্মদ জাহেদ (রহঃ)
৫। সৈয়দ আবু বকর জাকারিয়া (রহঃ)
৬। সৈয়দ আবদুর রহমান (রহঃ)
৭। সৈয়দ মোহাম্মদ (রহঃ)

৪। বিবি মাহ্‌বুবার গর্ভে ১০ পুত্র ঃ যথা —

১। সৈয়দ ইয়াহ্‌য়া (রহঃ)
২। সৈয়দ জিয়াউদ্দীন (রহঃ)
৩। সৈয়দ ইউসুফ (রহঃ)
৪। সৈয়দ আবদুল খালেক (রহঃ)
৫। সৈয়দ সাইফুর রহমান (রহঃ)
৬। সৈয়দ মুহাম্মদ ছালেহ্‌ (রহঃ)
৭। সৈয়দ হাবিবুল্লাহ (রহঃ)
৮। সৈয়দ মনছুর (রহঃ)
৯। সৈয়দ আবদুল জাববার (রহঃ)
১০। সৈয়দ আবু নছর মুছা (রহঃ)

দেশে দেশে গাউসে পাকের বংশধর

২২ জন কন্যার নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পুত্র আওলাদগণের মধ্যে সকলেই বিদ্যান ও বুজুর্গ ছিলেন। হযরত গাউসে পাক (রাঃ) নিজেই সকলের জাহেরী বাতেনী শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন। হযরত বড়পীব সাহেবের পূন্যবান পুত্রগণের কেউ কেউ বাগদাদ শরীফে এবং কেউ কেউ বাগদাদ শরীফের বাইরে অন্যত্র বসবাস করেছেন। এভাবে কালক্রমে ভারত উপমহাদেশেও তাঁর অধঃস্তন আওলাদগণ তশরীফ এনে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে গাউসে পাকের ষোড়শতম বংশধর সৈয়দ শাহ জাকের আলী জিলানী (রহঃ) প্রথমে ভারতের বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশেরই শাহ সৈয়দ রওশন আলী আলকাদেরী আল-জীলী (রহঃ) পূর্নিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। উপরোক্ত বংশেরই জামাতা সৈয়দ শাহ্‌ তোফায়েল আলী আল কাদেরী (রহঃ) মেদিনীপুরে বসতি স্থাপন করেন। সৈয়দ তোফায়েল আলী (রহঃ)-এর বংশধর ও নাতী হযরত সৈয়দ শাহ্‌ মুর্শেদ আলী আল কাদেরী আল জীলী আল বাগদাদী (রহঃ) কলকাতার তালতলায় খান্‌কায়ে কাদেরিয়া স্থাপন করেন। এই খান্দানের অসংখ্য মুরিদ মোতাকেদ বাংলা, বিহার, আসাম তথা সমগ্র ভারতে গাউসে পাকের তরিকা-ই-কাদেরিয়া প্রচার ও প্রসার করে চলছেন।

হযরত গাউসে পাকের আর এক খান্দান আফগানিস্তান হয়ে পেশোয়ারের হাজারা জিলার ছিরিকোট শরীফে এসে বসতি স্থাপন করেছেন এবং শরীয়ত ও তরিকত প্রচারে অমূল্য অবদান রেখেছেন। এই খান্দানের হযরতুল আল্লামা শাহ সৈয়দ আহমদ ছিরিকোটি (রহঃ) বার্মা, বাংলা, হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, আরব ও আফ্রিকা মহাদেশে তরিকা-ই-কাদেরিয়া প্রচার করেছেন। চট্টগ্রামে দ্বীনী সুন্নী প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সুন্নী সংস্কারমূলক কাজের গোড়া পত্তন করেছেন। তাঁরই সাহেবজাদা আমার পীর ও মুর্শেদ গাউসে জমান হযরতুল আল্লামা সৈয়দ হাফেজ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রাঃ) ঢাকার মোহাম্মদপুরে কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সুন্নীয়তের দূর্গ গড়ে তুলেছেন এবং পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে অতীত যুগের হারানো সুন্নাত-"জশ্‌নে-জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী" (দঃ) পুনঃ চালু করে তাজদীদীও সংস্কারমূলক কাজের সূচনা করেছেন। যার বরকতে আজ বাংলাদেশের সর্বত্র পবিত্র জশ্‌নে-জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) চালু হয়েছে এবং দিন দিন সুন্নীয়তের ভিত্তি মজবুত থেকে মজবুততর হতে চল্‌ছে। গাউসে পাকের মেদিনীপুর খান্দান ও ছিরিকোট শরীফ খান্দান সুন্নীয়ত প্রচারে এবং গাউসে পাকের কাদেরিয়া তরিকা প্রচারে অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাঁদের ফুয়ুজাত ও বারাকাত সকলকে নসীব করুন। গাউসে পাকের খান্দান ছাড়াও অসংখ্য সুন্নী মতাদর্শের পীর মাশায়েখগণ পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ও বাংলাদেশে ক্বাদেরিয়া তরিকা প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন। এই সুন্নী পীর মাশায়েখগণই তরিকতের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত সুন্নী মতাদর্শ জনগণের মধ্যে টিকিয়ে রেখেছেন। নতুবা ওহাবী তাবলীগী মউদুদী আন্দোলনে জনগণ কবেই পথভ্রষ্ট হয়ে

যেতো। ঈমান ও আমল রক্ষা করার বড় আশ্রয়স্থল হচ্ছে খানকা ও পীর মাশায়েখগণের দরবার এবং দরগাহসমূহ। তুফানের সময় মানুষ যেমন গাছের নীচে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পায়— তেমনিভাবে শয়তানী তুফানের ঝাপ্‌টা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অলীদের দরবার ও দরগাহসমূহ হচ্ছে ঈমানী আশ্রয়স্থল। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদে অলীগণের আশ্রয়ে থাকতে নির্দেশ করেছেন "ওয়া কুনু মাআছ ছাদেকীন" আয়াতের মাধ্যমে। এই তাৎপর্য যারা অনুধাবন করতে পারবে– তারাই কেবল শয়তানী তুফান ও ঝড়-ঝাপ্‌টা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ)-এর তরিকতের ছিল্‌ছিলা

হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) তরিকতের যে উত্তরাধিকার লাভ করেন, তার নাম "ছিলছিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়া"। গাউসে পাকের পূর্ববর্তী খেরকা প্রাপ্ত মাশায়েখগণের একটি ছিলছিলা নিম্নরূপ ঃ

১। রাহমাতুল্লিল আলামীন ছাইয়েদুল মোরছালীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দেঃ)।
২। শাহিনশাহে বেলায়েত হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)।
৩। সাইয়েদুস শোহাদা হযরত ইমাম হোছাইন (রাদিআল্লাহু আন্‌হু)।
৪। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ)
৫। হযরত ইমাম বাকের (রাঃ)
৬। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)
৭। হযরত ইমাম মুছা কাজেম (রাঃ)
৮। হযরত ইমাম মুছা রেজা (রাঃ)
৯। হযরত মা'রুফ কারখী (রাঃ)
১০। হযরত ছিররি ছাক্বতী (রাঃ)
১১। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাঃ)
১২। হযরত শেখ আবু বকর শিব্‌লী (রাঃ)
১৩। হযরত আবদুল ওয়াহেদ তামিমী (রাঃ)
১৪। হযরত আবুল ফারাহ্ তরতুছী (রাঃ)
১৫। হযরত আবুল হাছান কারশী হান্‌কারী (কুর্দী) (রাঃ)
১৬। হযরত আবু ছাঈদ মাখ্‌যুমী (রাঃ)
১৭। হযরত পীরানে পীর দস্তগীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)। (এই সিলসিলার নাম সিলসিলাতুয যাহাব)।

উক্ত ছিলছিলার মাধ্যমে আগত সমস্ত ওজিফা, ছবক, জিকির-আজকার ও অন্যান্য শোগল-আশগাল হযরত গাউসে পাক (রাঃ) বিধিবদ্ধ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। তাই এই বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনই "তরিকা-ই-ক্বাদেরিয়া" নামে পরিচিতি লাভ করে।

হযরত আলী (কঃ মাঃ ওয়াজহঃ) হতে ফয়েজপ্রাপ্ত চারজন খলিফা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন (১) হযরত ইমাম হাছান (রাঃ), (২) হযরত ইমাম হোছাইন (রাঃ), (৩) হযরত হাছান বসরী (রাঃ), (৪) হযরত খাজা কামিল ইবনে যিয়াদ (রহঃ)। একারণেই কোন কোন ছিলছিলায় হযরত গাউসে পাকের পূর্বতন শাজরায় ইমাম হাছান (রাঃ) সূত্রে এবং হযরত হাছান বসরী (রাঃ) সূত্রেও শাজ্‌রা দেখা যায়। হযরত গাউসে পাক (রাঃ) ঐ সমস্ত সূত্রেও ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মূলতঃ সকল শাজ্‌রার মূল উৎস হচ্ছেন হযরত আলী (রাঃ) যিনি শাহেনশাহে বেলায়ত খেতাবে ভূষিত। তবে উপরে বর্ণিত শাজরাই সর্বোত্তম এবং এই শাজরাকে "সিলসিলাতুয যাহাব" বা স্বর্ণ সিলসিলা বলা হয়। আর একটি সিল্‌সিলা হযরত মারুফ কারখী (রাঃ)-এর উর্ধে হযরত দাউদ তায়ী, হযরত হাবীব আযমী, হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হয়ে আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী (কঃ ওয়াজঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ধারা বা সিলসিলাকে বলা হয় "সিলসিলাতুশ শায়খ" বা বিখ্যাত মাশায়েখগণের সিলসিলা। উভয় সিলসিলাই বরহক এবং ফয়েজ প্রাপ্তির উৎস।

গাউসে পাক (রাঃ) ও খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ)

বংশগতভাবে হযরত গাউসে পাক (রাঃ) এবং হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ) উভয়েই আওলাদে রাসুল ছিলেন। হযরত গাউছে পাকের পিতা ছিলেন হাছানী বংশের এবং মাতা ছিলেন হোছাইনী বংশের। এজন্য তিনি হাছানী-হোছাইনী। অপর দিকে হযরত খাজা গরীব নাওয়াজ ছিলেন এর বিপরীত। তাঁর পিতা ছিলেন হোছাইনী বংশের এবং মাতা ছিলেন হাছানী বংশের। সেজন্য তিনি হলেন হোছাইনী–হাছানী। সম্পর্কে হযরত গাউসুল আজম ছিলেন মামা এবং খাজা বাবা ছিলেন ভাগিনা। গাউছে পাকের চাচার মেয়ে ছিলেন খাজা বাবার মা। বয়সের ক্ষেত্রে প্রায় ৬২ বৎসরের ব্যবধান। ৫৩২ হিজরীতে হযরত খাজা গরীবের জন্ম। সেসময় হযর বড়পীর সাহেবের বয়স ছিল ৬২ বৎসর। হযরত বড়পীর সাহেবের জন্মস্থান ছিল ইরানের জীলান শহরে, আর খাজা গরীব নাওয়াজের জন্মস্থান ছিল আফগানিস্থানের সিসতান শহরে।

গাউসে পাকের কদম মোবারক খাজা গরীব নাওয়াজের মাথায় ও চোখে

হযরত গাউসুল আ'জম ৫৫৯ হিজরীতে অর্থাৎ ইনতিকালের তিন বৎসর পূর্বে এক রাত্রে বাগদাদ শরীফে ওয়াজ ও নসিহত করছিলেন। ঐ মজলিশে শায়খ আলী ইবনে

হাইতী (রহঃ), শায়খ বাক্কা ইবনে বতু (রহঃ), শায়খ আবু ছাঈদ ক্বলবী (রহঃ), শায়খ নজিব সোহ্‌রাওয়ার্দী (রহঃ) প্রমূখ নামকরা অলীগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে জজ্‌বার হালাতে হঠাৎ গাউসে পাক (রাঃ) এক মহাবাণী উচ্চারন করলেন ঃ

قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللّٰهِ

অর্থাৎঃ প্রত্যেক অলী আল্লাহর কাঁধের উপর আমার কদম স্থাপিত। এই মহাবাণী উচ্চারনের সাথে সাথে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পৃথিবীর সমস্ত অলী আল্লাহগণ নিজ নিজ কাঁধ নত করে দেন এবং গাউসে পাকের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। সর্ব প্রথম মজলিশে উপস্থিত হযরত আলী ইবনে হাইতী (রহঃ) নিজ কাঁধ নীচু করে ধরেন এবং গাউসে পাকের কদম চুম্বন করেন। উপস্থিত সকল অলীগণই একে একে নিজ নিজ কাঁধ নীচু করে গাউসে পাকের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। দারাশিকোর "সফিনাতুল আউলিয়া" গ্রন্থে আবু ছাঈদ ক্বাইলুবীর বরাতে উল্লেখ আছেঃ সে সময় নবী করিম (দঃ) গাউসুল আ'জমকে একটি নূরানী পোষাক পরিয়ে দেন।

ঐ সময় হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাঃ) হিন্দুস্থানের পথে খোরাসানের এক পর্বত গুহায় ধ্যানরত ছিলেন। তিনি সেখান থেকে বাগদাদ শরীফের এই ঘোষণা আধ্যাত্মিকভাবে শুনতে পেয়ে সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ

قَدَمُكَ عَلٰى عَيْنِيْ وَ رَأْسِيْ

অর্থাৎঃ আপনার চরণযুগল আমার কাঁধে নয়, বরং চোখে ও মাথায় স্থাপন করে নিলাম। হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ) খাজাবাবার এই আদব ও নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে "সুলতানুল হিন্দ" উপাধী দান করেন। "মঈনুদ্দীন" হলো রাসুলে পাকের দান, আর "সুলতানুল হিন্দ" হলো গাউসে পাকের দান। কেয়ামত পর্যন্ত খাজা বাবা হিন্দুস্থানের সুলতান বা আধ্যাত্মিক সম্রাটরূপে বিরাজ করবেন। আমরা ভারতবাসী তাঁর আধ্যাত্মিক প্রজা। হযরত শাহজালাল (রাঃ) হলেন বাংলার অলীদের সর্দার। এগুলো মেনে নেয়ার মধ্যেই রয়েছে আমাদের প্রকৃত পরিচয়। তাঁদেরকে বাদ দিয়ে এদেশে প্রকৃত ইসলাম টিকতে পারে না।

৩১৩ জন অলীর স্বীকৃতি

কুতুব লুলু আরমিনী বলেনঃ

হযরত বড়পীর সাহেব (রাঃ) যখন— "আমার চরনযুগল সমস্ত অলীগণের গ্রীবাদেশে" ঘোষণা করেন, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ৩১৩ জন নিয়ন্ত্রণকারী অলী আল্লাহ ছিলেন। তন্মধ্যে মক্কা ও মদিনা শরীফে ১৭ জন, ইরাকে ৬০ জন, আজম

দেশের বিভিন্ন স্থানে ৬০ জন, শামদেশে ৩০ জন, মিশরে ২০ জন, মাশরিক বা প্রাচ্যে ২৭ জন, ইয়ামনে ২৩ জন, আবিসিনিয়ায় ১১ জন, সিংহলে ৭ জন, ককেসাস পর্বতে ৪৭ জন, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীরের মধ্যে (রাশিয়া) ৭ জন এবং সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলে ৪ জন - এই ৩১৩ জন অলী আল্লাহ ছিলেন। আজম দেশের ৬০ জনের মধ্যে একজন ব্যতীত বাকী ৩১২ জনের প্রত্যেকেই গাউসে পাকের ঘোষণার সাথে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজ নিজ গ্রীবাদেশ নত করে দিয়েছিলেন। অলীগণের বিনা তারের এই যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক কালের আকাশী যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও হার মানিয়েছে। আলী নামের ঐ একজন অলীর বেলায়েতী শক্তি মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হয়ে যায়। কথিত আছে ঃ পরবর্তীকালে সে এক খৃষ্টানের বাড়ীতে চাকুরী গ্রহণ করে এবং শুকর চড়ানোর কাজে নিয়োজিত হয়। একদিন শুকর পাল নিয়ে নদী পার হওয়ার সময় একটি বাচ্চা শুকরকে কাঁধে করে পার করার পর তাঁর হুঁশ আসে। হায়! গাউসে পাকের কদম কাঁধে নিতে অস্বীকার করায় আজ এই পরিণতি। আজ আমার কাঁধে শুকরছানা চড়েছে। অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করার পর এবং গাউসে পাকের কর্তৃত্ব স্বীকার করার পর তাঁর লুপ্ত বেলায়েত সে ফিরে পায়। হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ) তাঁর মক্‌তুবাত শরীফের ১২৩ নম্বর মকতুবে (৩য় খন্ড) লিখেছেনঃ "হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর যমানা থেকে আরম্ভ করে কেয়ামত পর্যন্ত যত আউলিয়া আবদাল, আকতাব, আওতাদ, নুজাবা, নুক্বাবা, গাউস অথবা মুজাদ্দেদের আবির্ভাব হবে, তাঁরা সকলেই তরিকতের ফয়েজ, বরকত ও বেলায়েত অর্জনের বেলায় গাউসুল আ'জমের মুখাপেক্ষী। তাঁর মাধ্যম বা উছিলা ছাড়া কেয়ামত পর্যন্ত কোন ব্যক্তি অলী হতে পারবে না"।

(সূত্রঃ তাবলীগ পত্রিকা শর্ষিনা ১৯৭০ ইং মে সংখ্যা)

গাউসুল আ'জমের খান্‌কায় খাজা গরীব নাওয়াজের চিল্লাকাশী

জুব্‌দাতুল আরেফীন হযরত সৈয়দ গোলাম হোসাইন চিশ্‌তী আবুল আলাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেন, "হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী সাঞ্জারী (রাঃ) যখন হিন্দুস্থানের বেলায়ত প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি স্বীয় পীর ওসমান হারূনী (রহঃ)-এর সাথে মদিনা মোনাওয়ারায় হুজুরে আক্‌রাম (দঃ)-এর রওজা মোবারক জিয়ারতে ছিলেন। খাজা ওসমান হারূনী (রহঃ) তাঁকে হিন্দুস্থানের বেলায়েত প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদানপূর্বক বললেনঃ তুমি হিন্দুস্থানে রওনা দেয়ার পূর্বে অবশ্যই বাগদাদ শরীফ গিয়ে হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং কিছুদিন তাঁর খেদমতে থাকবে। নির্দেশ মোতাবেক খাজা গরীব নাওয়াজ নিজ জন্মভূমি সাঞ্জার গমন করে খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রহঃ) কে সাথে নিয়ে বাগদাদ শরীফ গমন করেন। হযরত গাউসে পাক (রাঃ) হযরত কুতুবুদ্দীনকে দেখেই বলে উঠলেন ঃ এই যুবকটি তো যুগের কুতুবুল আক্‌তাব।

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাঃ) তিন মাস গাউসে পাকের দরবারে অবস্থান করেন এবং ৪০ দিন পর্যন্ত নীরবে চিল্লা করেন। পাউসে পাকের ফয়েজ ও দোয়া নিয়ে হিন্দুস্থানের আজমীর পানে রওনা হন। এই সময়ে একদিন গাউসে পাক (রাঃ) খাজা বাবার জন্য মজ্‌লিশে ছামার (প্রেম গাঁথা) ব্যবস্থা করেন। আরবী শায়ের যখন কয়েকটি বয়েত সুর দিয়ে পাঠ করেন, তখন খাজা গরীব নাওয়াজ (রাঃ) ওয়াজ্‌দের হালতে জমিনে পদাঘাত করতে থাকেন এবং চিৎকার করতে থাকেন। হযরত গাউসে পাক (রাঃ) একটি লাঠি চিবুকের নীচে রেখে জমীনকে জোরে চেপে ধরেন এবং ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েন। মজলিশ ভঙ্গের পর তিনি বললেনঃ মঈনুদ্দীনের জজ্‌বার পদাঘার্তে জমীন উলট পালট্‌ হতে যাচ্ছিল। তাই আমি লাঠি দিয়ে জমীনকে চেপে ধরেছিলাম"। (গাউসুল আ'জম-নূরুর রহমান) অলী আল্লাহ এবং আম্বিয়ায়ে কেরামগণের চিল্লা হলো— নির্জনে একাধারে ৪০ দিন গোপন সাধনা করা। বর্তমানে ছয় উছুলী তাব্‌লীগের নামে ৪০ দিনের জন্য মসজিদে মসজিদে গাশ্‌ত করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার নাম রাখা হয়েছে চিল্লা। যা নবী ও অলীগণের তরিকার সম্পূর্ণ খেলাফ।

হযরত গাউসুল আ'জম হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিলেন ঃ লা-মযহাবীর পরিচয়

ইসলামের শরা-শরীয়তের ব্যবহারিক আইন কানুন ও বিধি বিধান-এর ক্ষেত্রে চারটি মযহাব বর্তমানে অনুসরণ করা হচ্ছে। চার মাযহাবের যে কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিজরী ৪র্থ শতকে। এর খেলাফ করা জায়েজ নয়। কিন্তু ইব্‌নে তাইমিয়া ও তার অনুসারীরা কোন মযহাব মান্‌তে রাজী নয়। তারা কোরআন হাদীসের ব্যখ্যা তাদের ইচ্ছামত করে তার অনুসরণ করে থাকে। তাদেরকে আহ্‌লে হাদীস বা লা-মাযহাবী বলা হয়। এরা গোম্‌রাহ সম্প্রদায়। বর্তমানে এরা ছালাফী নামে একটি উপদল সৃষ্টি করেছে এবং নামের শেষে ছালাফী শব্দ যোগ করে তাদের মতবাদের পরিচয় দিয়ে থাকে। যেমন আবদুল মতিন ছালাফী— ইত্যাদি। সউদী আরবে এর উৎপত্তি হয়েছে। এভাবে তারা ইসলামকে শতধা বিভক্ত করে ফেলেছে। ইয়েমেনের ইমাম শওকানী, নজ্‌দের ইব্‌নে ওহাব নজ্‌দী, ভারতের ইসমাঈল দেহলভী, দিল্লীর নাজির হোসাইন দেহ্‌লভী, আবদুল্লাহ গজ্‌নভী, পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী সাদেকপুরী, ভূপালের নবাব সিদ্দিক হাসান, রাজশাহীর আবদুল্লাহিল কাফী ও আবদুল্লাহিল বাকী এবং ডঃ আবদুল বারী লা-মযহাবীদের নেতা। তারা মযহাব মানাকে শির্‌ক বলে থাকে। মাওলানা আবুল আলা মৌদুদী তার রাসায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থের ২৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ঃ "আমার মতে (মৌদুদী) কোন আলেমের পক্ষে নির্দিষ্ট কোন মযহাব মানা বা তাক্‌লীদ করা শুধু কবিরা গুনাই নয়— বরং এর চেয়েও কঠিন গুনাহর কাজ" (অর্থাৎ শিরক)। ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর লিখিত শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা- ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ে লা-মযহাবীদের ইতিহাস দেখুন।

এবার আমরা দেখবো— হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ), খাজা গরীব নাওয়াজ (রাঃ), খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ (রাঃ) এবং হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে সানী (রাঃ)-চার তরিকার ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তাক্‌লীদ বা মযহাব অনুসরণ করতেন কিনা। হযরত বড়পীর সাহেব (রাঃ) শরীয়তের বিধি বিধানে হাম্বলী মযহাবের অনুসারী। তাঁর পিতা হযরত সৈয়দ আবু সালেহ্‌ মূছা জঙ্গীদোস্ত (রহঃ) ও তাঁর পীর হযরত আবু ছাঈদ মখ্‌জুমী (রহঃ) ও হযরত হাম্মাদ দাববাস (রহঃ) সকলেই ছিলেন হাম্বলী মযহাবের অনুসারী। কেননা, বাগদাদ শরীফে তখনকার দিনে হাম্বলী মযহাবের প্রভাব ছিল বেশী। হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী (রাঃ), খাজা বাহাউদ্দীন (রাঃ) ও হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রাঃ)—এই তিন ইমামুত তরীকত ছিলেন হানাফী মযহাবভুক্ত। লা-মযহাবী বা আহলে হাদীস এবং মৌদুদী সাহেবের মন্তব্য অনুযায়ী এই চার তরিকার চারজন ইমামই শির্‌কভূক্ত মুশরিক সাব্যস্থ হয়ে যান এবং চার মযহাবভুক্ত সকল মুসলমানই মুশ্‌রিক হয়ে যায়। নাউজুবিল্লাহ! এভাবে লা মযহাবীরা ও মৌদুদীর অনুসারীরা ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানকে মুশরিক ধারণা করে। মৌদুদী সাহেব তার "তাজদীদ ও ইয়াহ্‌ইয়ায়ে দ্বীন" বা ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন নামক পুস্তকের ৫-৬ পৃষ্ঠায় মযহাব ও তরিকতের বিধি বিধানকে শিরিক মিশ্রিত জাহেলিয়াত (জাহেলিয়াতে মুশরিকানা)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন- নাউজুবিল্লাহ।

মউদুদী ও লা মযহাবীরা হানাফী সুন্নী ও তরিকা জগতের খতরনাক দুশ্‌মন। নজ্‌দের মূল ওহাবীরা মযহাব এবং তরিকত-উভয়েরই দুশমন। ভারতীয় দেওবন্দী ওহাবীরা এই ক্ষেত্রে নজ্‌দী ওহাবীদের থেকে ভিন্ন। এরা মযহাবও মানে এবং তরিকতও শিক্ষা দেয়। কিন্তু বাতিল আক্বিদার ক্ষেত্রে তারা ইব্‌নে ওহাব নজ্‌দী ও ইসমাঈল দেহ্‌লভীর অনুসারী। কাজী ফজলুর রহমান (রহঃ)-এর উর্দূ কিতাব আন্‌ওয়ারে আফ্‌তাবে সাদাকাত- এ দেওবন্দী ওহাবী ও হাটহাজারী ওহাবীদের ইতিহাস দেখা যেতে পারে।

হযরত গাউসুল আ'জম বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) শরীয়তের ফতোয়া দিতেন হাম্বলী মযহাব মতে। তাঁর গুনিয়াতুত্‌ তালেবীন কিতাবে ইবাদত ও মোয়ামালাত অংশে যে সব মস্‌আলা ও নিয়ম কানুন লেখা আছে, তা হাম্বলী মতানুযায়ী। আমরা হানাফী মযহাবের অন্তভুক্ত। তরিকতের বিধি বিধানে আমরা গাউসে পাক (রাঃ)-এর অনুসারী। কিন্তু নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত, তাহারাত ইত্যাদি শরীয়তী মাসায়েলের ক্ষেত্রে আমরা হানাফী মযহাব অনুসরণ করে থাকি। মযহাব এবং তরিকত-দুটি পৃথক বিষয়। মযহাবে শিক্ষা দেয়া হয় বাহ্যিক আচার আচরন বা নিয়ম কানুন। তরিকতে শিক্ষা দেয়া হয় আভ্যন্তরীণ রূহ, ক্বল্‌ব্‌ ও নাফ্‌স্‌ সম্পর্কে। জাহেরী আমলের নাম শরীয়ত ও মযহাব এবং বাতেনী আমলের নাম হলো তরিকত। সুতরাং একটির সাথে আর একটির কোন বৈপরিত্ব বা দ্বন্দ্ব নেই। আমরা একই সাথে জাহেরী নিয়ম-কানুন হানাফী মতে এবং বাতেনী নিয়ম কানুন ক্বাদেরিয়া

তরিকা মতে পালন করে থাকি। তরিকার ছবক হিসাবে যে সব নফল নামাজ আদায় করতে হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে তরিকার ইমামেরই অনুসরন করতে হবে সবক ও ওজিফা হিসাবে। যেমন সালাতুল গাউছিয়া ও সালাতুল খায়ের— ইত্যাদি।

হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ)-এর ইনতিকাল ও বেছালে হক্ব

প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) তাঁর ইনতিকালের সময় সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন। পরিবারের সকলকে এ সংবাদ দিলে সকলেই শোকার্ত ও চিন্তান্বিত হয়ে কান্নাকাটা করতে থাকেন। ৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা রবিউসসানী হতে হযরতের অসুখ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইনতিকালের পূর্বক্ষণে তিনি নূতন করে গোসল করেন এবং এশার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে দীর্ঘ সিজ্‌দায় পতিত হন এবং পরিবার ও মুরিদগণের জন্য দীর্ঘ সময় দোয়া করেন। দোয়ার মধ্যে সমগ্র উম্মতের জন্যও এভাবে দোয়া করেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ + اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ + اَللّٰهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"ইয়া আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর উম্মতগণকে ক্ষমা করে রহম করো। হে আল্লাহ! উম্মতে মোহাম্মদী (দঃ)-এর গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দাও"।

তিনি সিজদা হতে মাথা উঠাবার পর গায়ব হতে একটি আওয়াজ ভেসে আসলোঃ

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً -
فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ٥

"হে প্রশান্ত আত্মা! নিজের পর্‌ওয়ারদেগারের দিকে ফিরে আস এমন অবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আমার প্রকৃত বান্দাগণের দলে শামিল হয়ে আমার বেহেস্তে প্রবেশ করো" (সুরা আল-ফজর)। উক্ত দুটি আয়াতে দুটি সুসংবাদ— মৃত্যকালে খোদার সন্তুষ্টি লাভ এবং হাশরের দিনে নেক্‌কারদের দলভুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ। সুব্‌হানাল্লাহ! উক্ত আওয়াজ শুনে গাউসে পাক (রাঃ) লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং নীচের দোয়াটি পাঠ করলেন ঃ

اَسْتَعِنْتُ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَىُّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ وَلَا يَخْشٰى +
سُبْحَانَ مَنْ تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَقَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ +
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

"আমি সেই মহান সত্তার সাহায্য প্রার্থনা করছি- যিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব— যাঁর মৃত্যু নেই এবং ভয়ও নেই। পবিত্র সেই মহান সত্তা— যিনি নিজ কুদরত ও শক্তি বলে সম্মানীত। যিনি মৃত্যুদানের বেলায় বান্দার উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত মহান রাসুল"।

এই কলেমা ও দোয়া পাঠ করার সাথে সাথেই রূহ মোবারক আ'লা ইল্লিয়্যিন-এর প্রতি মনোনিবেশ করলো। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আস্‌লো এবং তিনি আপন মাহ্‌বুবের দরবারে চলে গেলেন— বেছালে হক্ব প্রাপ্ত হলেন। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"।

হযরতের পবিত্র ললাটে শীতল ঘাম দেখা দিল এবং পবিত্র চেহারায় নূরের শিখা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ৫৬১ হিজরীর ১১ই রবিউসসানী সোমবার পূর্ব রাতে বাদ এশা হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহ আন্‌হু লক্ষ লক্ষ মুরিদ ও আপন পরিবারবর্গকে শোক সাগরে ভাসিয়ে ইন্‌তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ----- ।

ইন্‌তিকালের সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। গোটা বাগদাদ শরীফ শোকের সাগরে পরিণত হলো। স্রোতের ন্যায় মানুষ আসতে লাগলো বাগদাদ শহরে। বাগদাদ শহর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট লোক সমুদ্রে পরিণত হলো। ফলে পরদিন রাত্রে হযরতের দাফন করতে হয়। হযরত বড়পীর সাহেবের প্রিয় মাদ্রাসা "বাবুল আ'জাজ" প্রাঙ্গনে তাঁকে দাফন করা হয়। বর্তমানে মাজার শরীফ মাদ্রাসা প্রাঙ্গনেই অবস্থিত। বর্তমানে উক্ত স্থান "বাবুশ শায়খ" নামে পরিচিত। সমগ্র পৃথিবী হতে আগত হাজার হাজার ভক্ত ও আশেকান প্রতিদিন হযরতের মাজার শরীফ জিয়ারত করেন। শুধুমাত্র হযরত গাউসে পাকের কারণেই একদিনের বাগদাদ শহরকে "বাগদাদ শরীফ" নামে অভিহিত করা হয়। তদ্রূপ আজমীরকে "আজমীর শরীফ", বিহারকে "বিহার শরীফ" নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ পরিচিত হয় স্থানের নামে, কিন্তু স্থান পরিচিত হয় মহামানবগণের নামে। আরবীতে বলা হয় ঃ شَرُفَ الْمَكَانُ بِالْمَكِيْنِ "স্থান ধৈন্য হয় উক্তস্থানে বসবাসকারী মহা মানবদের কারণে"।

দাফন করার পর হযরত বড়পীর সাহেবের মাজারে যখন মুনকার-নকীর ফেরেস্তাদ্বয় আগমন করে প্রশ্ন করেন, তখন গাউসে পাক ফেরেস্তাদের সাথে কি আলোচনা ও ব্যবহার করেছিলেন— তার বর্ণনা অত্র গ্রন্থের কারামত অধ্যায়ে বর্ণিত ২৯ নম্বর কারামতে দেখুন। "কিতাবুল আছরার" সূত্রে উক্ত কারামত বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজ্‌দহম

৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৬৭ ইংরেজী ১১ই রবিউসসানী সোমবার পূর্ব রাত্রে হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ) ইনতিকাল করেন। এই পবিত্র তিরোধানকে চিরজাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে সমগ্র বিশ্বে প্রতি বৎসর ঐ তারিখে "ফাতেহা-ই-ইয়াজ্‌দহম" শরীফ পালন করা হয়। বাগদাদ শরীফে ঐ দিন লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আশেকগণের ঢল নামে সেদিন বাগদাদ শরীফে। হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশে এই তারিখে ফাতেহা -ই-ইয়াজ্‌দহম ও উরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে যাতে সরকারী কর্মচারীগণ "ফাতেহা-ই-ইয়াজ্‌দহম" উদযাপনে শরীক হতে পারেন— সে উদ্দেশ্যে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে "বাংলার আইন পরিষদে" ঐ দিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করেছিল। (সূত্রঃ গাউসোল আ'জম হযরত বড়পীর সাহেব। মৌলভী রজব আলী)। বড়ই পরিতাপের বিষয়— মুসলমানের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এই বাংলাদেশে আজো "ফাতেহা-ই-ইয়াজ্‌দহম" উপলক্ষে এই দিনে কোন সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়নি। অথচ অন্যান্য ধর্মের দূর্গা, কালী, সরস্বতি দেব-দেবীর পূজার সময় সরকারী ছুটি থাকে। বাতিল পন্থী তাব্‌লীগ জামাতের টঙ্গী এজ্‌তেমার দিনও ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। নাউজু বিল্লাহ!

গেয়ারবী শরীফ পালন

হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ)-এর তরিকাভুক্ত মুরিদ ও ভক্তগণ প্রতি চান্দ্র মাসের ১১ তারিখে অত্যন্ত ভক্তির সাথে "গেয়ারবী শরীফ" যথানিয়মে পালন করে থাকেন। হযরত গাউসে পাক (রাঃ)-এর রূহ্ মোবারকে সাওয়াব রেছানী ও দুনিয়া আখেরাতের কল্যানের জন্য এই গেয়ারবী শরীফের খতম ও মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয় এবং গাউসে পাকের জীবনী ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তাফ্‌সীরে নাঈমী-তে গেয়ারবী শরীফের ঐতিহাসিক তিত্তি এভাবে প্রমাণ করা হয়েছেঃ

"হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল, নূহ (আঃ)-এর কিস্তি দুনিয়াতে অবতরণ, ইবরাহীম (আঃ)-এর নমরূদের অগ্নিকুন্ড হতে মুক্তি লাভ, আউয়ুব (আঃ)-এর রোগ মুক্তি, মুছা আলাইহিস সালামের নীল দরিয়া পার ও ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন এবং

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর কোরআন মজিদের সুরা আল ফাত্‌হ-এর আয়াত "লিয়াগ্‌ফিরা লাকাল্লাহু মা তাক্বাদ্দামা মিন্ জাম্‌বিকা ওয়ামা তাআখ্যারা" নাজিল হয়। এ আয়াতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উম্মতের গুনাহ্ ক্ষমা করার মহান ঘোষণা দেয়া হয়। উপরোক্ত সব ঘটনা ১০ই মুহররম তারিখে সংঘটিত হয়েছিল এবং সকল নবীগণ ১১ই রাত্রে এর শুকরিয়া স্বরূপ ইবাদত বন্দেগী করতেন"। সুতরাং গেয়ারবী শরীফ নবীগণেরই সুন্নাত। নবী করিম (দঃ) স্বপ্নের মাধ্যমে এই গেয়ারবী শরীফ গাউসে পাককে দান করেন। (মিলাদে শায়খে বরহক)। মম রচিত 'গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস' দেখুন।

হযরত গাউসে পাকের সমসাময়িক কয়েকজন বিখ্যাত অলী-আল্লাহ্‌র নাম

হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর সমসাময়িক আউলিয়ায়ে কেরাম— যাঁরা ইরাক বা অন্যদেশে বাস করতেন, তাঁরা সবাই গাউসে - পাকের দরবারে যাতায়াত করতেন এবং ফয়েজ ও বরকত লাভ করতেন। ঐ সমস্ত বুজুর্গানের কতিপয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক নং	নাম	দেশ	ইনতিকাল	
১।	তাজুল আরেফীন হযরত শায়খ আবুল ওয়াফা (রহঃ)	ইরাক	ইনতিকাল	৫০১ হিজরী।
২।	সৈয়দ আহমদ রেফায়ী (রহঃ)	মুসেল	"	৫৭৮ হিজরী।
৩।	শায়খ আহমদ শাবান্‌কী (রহঃ)	হাদাবিয়া (কুর্দিস্তান)	"	-
৪।	শায়খ এযায ইবনে মুস্‌তাওদা বাতায়েহী (রহঃ)	ইরাক	"	-
৫।	শায়খ হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস (রহঃ)	সিরিয়া (গাউসে পাকের ওস্তাদ)		৫২৫ হিজরী।
৬।	শায়খ আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামাদানী (রহঃ)	হামাদান (ইরান)	"	৫৩৫ হিজরী।
৭।	শায়খ আ'ক্বীল মানজানী (রহঃ)	সিরিয়া	"	-
৮।	শায়খ আবু ইয়া'জী মাগরেবী (রহঃ)	ফাছ (মরক্কো)	"	-
৯।	শায়খ আ'দি ইবনে মুসাফির (রহঃ)	মুসেল	"	-
১০।	শায়খ আলী ইবনে হাইতী (রহঃ)	যারিরান (ইরাক)	"	৫৬৪ হিজরী।
১১।	শায়খ আবদুর রহমান তাফসুজ্জী (রহঃ)	আবাদান (ইরাক)	"	-
১২।	শায়খ বাক্বা ইবনে বতু (রহঃ)	নাহরুলমূলক (ইরাক)		৫৫৩ হিজরী।
১৩।	শায়খ আবু ছাঈদ ক্বাইলূবী (রহঃ)	ইরাক	"	৫৫৭ হিজরী।
১৪।	শায়খ মাজেদ কুর্দী (রহঃ)	হামদীন (কুর্দ)	"	৫৬১ হিজরী।
১৫।	শায়খ জাগীর (রহঃ)	সামাররা (ইরাক)	"	-
১৬।	শায়খ আবু মোহাম্মদ কাছেম বস্‌রী (রহঃ)	বস্‌রা (ইরাক)	"	৫৮০ হিজরী।
১৭।	শায়খ ছুয়াইদ সান্‌জারী (রহঃ)	সান্‌জার (আফগানিস্তান)	"	-

ক্রমিক নং	নাম	দেশ		ইনতিকাল
১৮।	শায়খ আবু মাদ্‌য়ান শোয়াইব (রহঃ)	-	"	-
১৯।	শায়খ আবু আ'মর ওসমান বাতায়েহী (রহঃ)	বাতায়েহ (ইরাক)	"	-
২০।	শায়খ ওসমান হারুনী (রহঃ)	হারুন (সিস্তান)	"	-
২১।	হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমেরী (রহঃ)	সাঞ্জার	"	৬৩২ হিজরী।

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত আউলিয়ায়ে কেরামগণ অনেক উঁচু স্তরের অলী-আল্লাহ ছিলেন। তাঁদের কারামত ও অলৌকিক শক্তি ছিল অবাক করার মত। তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

হযরত গাউসে পাকের চরিত্র মাধূর্য ও উচ্চ আখ্‌লাক

হযরত গাউসে পাকের গোটা জীবনই ছিল উত্তম আদর্শ। তাঁর প্রতিটি আচার ব্যবহার ও চালচলনই নবী করিম (দঃ)-এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কোন জীবনী লেখকের পক্ষেই হযরতের জীবন পদ্ধতি ও আখ্‌লাকে হাছানাহ্‌র প্রকৃত মূল্যায়ন করা মোটেই সম্ভব নয়। বাহ্‌জাতুল আসরার, নুজহাতুল খাতির, আখ্‌বারে আখ্‌ইয়ার, মানাক্বেবে গাউছিয়া গ্রন্থসমূহে হযরতের যেসব আদব, আখ্‌লাক, জীবন পদ্ধতি, হেদায়াতের বাণী ও কারামাত নির্ভরযোগ্য সূত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার থেকে কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বরকত হাছেল করার জন্য উল্লেখ করা হলো ঃ

আকৃতি ও প্রকৃতি

হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর দেহের গঠন ছিল মধ্যমাকারের। শরীর মোবারকের রং ছিল গন্দুমী রং অর্থাৎ ফর্শা সুন্দর। সিনা মোবারক প্রশস্ত, ক্ষীণ এবং দেহ মোবারক অতি কোমল নরম ও তুলতুলে। ভ্রুযুগল অতি সরু এবং পরস্পর মিলিত। চেহারা মোবারকে নূরের আভা, কণ্ঠস্বর সুউচ্চ ও সুমধূর। নীরবতা ছিল হযরতের স্বভাব। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। মানুষের সাথে মেলা-মেশা কম করতেন। পোড়ো বাড়ী, নির্জন স্থানে ইবাদত করতে ভালবাসতেন। ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারন গম্ভীর। ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। কোন রাজা বাদ্‌শা ও উজির নাজির হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলে তয় ও ভক্তিতে নত হয়ে যেতো। তিনি তাঁদের প্রতি তাজিম প্রদর্শনে ছিলেন উদাসীন। প্রজাদের প্রতি সদয় আচরনের জন্য কঠোর ভাষায় তাদের উপদেশ দিতেন। অপরদিকে গরীব, মিছকিন ও সাধারন জনগণের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহবান। তিনি প্রতি শুক্রবারে পোষাক ও জুতা পরিবর্তন করতেন এবং ব্যবহৃত পোষাক ও জুতা কোন অভাবী লোককে দান করে দিতেন। খাওয়ার সময় নিজস্ব জমির উৎপন্ন শস্য হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং উপস্থিত সকলকে নিজ হাতে খাদ্য পরিবেশন করতেন।

কাজের সময় বন্টন ও নিয়মানুবর্তিতা

হযরত গাউসুল আ'জম দিবা রাত্রির ২৪ ঘন্টা তালিম, শিক্ষা, ফতোয়া দান, ওয়াজ নছিহত, ব্যক্তিগত রিয়াযত ও আরামের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন। এক মূহুর্ত যেন অপচয় বা অপব্যয় না হয়, সেদিকে তিনি নজর রাখতেন। হুজুর গাউসে পাক (রাঃ) সকাল বেলা তালিম - তাওয়াজ্‌জুহ্‌ও সবক দান করতেন। এরপর মাদ্রাসার শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকতেন। বিজ্ঞ বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম তাঁর দর্‌সের মজ্‌লিশে শামিল হতেন। আল্লামা জামালুদ্দীন ইব্‌নে জাওযী (রহঃ) হাদীসের বিজ্ঞ ইমাম ও পর্যালোচনাকারী হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। প্রথমে তিনি গাউসে পাকের সমালোচনাকারী ছিলেন। একদিন গাউসে পাকের মাদ্রাসায় কোরআনের তাফসীর ক্লাশে বসে গাউসে পাকের তাফ্‌সীর শুন্‌ছিলেন। একটি আয়াতের এগারটি ব্যাখ্যা ইব্‌নে জাওযী অবগত ছিলেন। হযরত গাউসুল আ'জম ঐ আয়াতের ৪০টি ব্যাখ্যা দিলেন। ইব্‌নে জাওযী গাউসে পাকের এই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে এতই বিস্ময়াপন্ন হয়ে পড়লেন যে, অবশেষে দিশে হারা হয়ে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং আত্মহারা হয়ে গায়ের জামা কাপড় ছিড়ে ফেললেন। তাঁর এলেমের সমস্ত দম্ভ এক মূহুর্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। ইব্‌নে জাওযী সাথে সাথে গাউসে পাকের হাতে বাইয়াত হয়ে মুরীদ হয়ে গেলেন। পরে গাউসে পাকের সুখ্যাতি বর্ণনা করে তিনি কিতাবও লিখেছেন।

হযরত গাউসে পাক সপ্তাহে তিন দিন— শুক্র, রবি ও মঙ্গলবার - মতান্তরে শুক্র, শনি ও রবিবার তিন জায়গায় ওয়াজ মজ্‌লিশ কায়েম করতেন এবং সর্ব সাধারণকে তাঁর অমিয়বাণী দ্বারা সিক্ত করতেন। উক্ত মজ্‌লিশে ওয়াজের তাছিরে কিছু কিছু লোক মারাও যেতো। রাত্রের অধিকাংশ সময় তিনি বিনিদ্র ইবাদতে কাটাতেন। কথিত আছেঃ এশার অজু দ্বারা তিনি একাধারে ৪০ বৎসর পর্যন্ত ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। মাতৃগর্ভ হতে অলী হয়ে জন্ম গ্রহণ করা স্বত্বেও তিনি এরূপ কঠিন ইবাদত করেছেন। এগুলোর আস্বাদনকারী ব্যতিত অন্য কেউ এর মর্ম অনুধাবন করতে পারবেনা। তিনি বলেছেন ঃ এশ্‌কে মাওলা আমার নিদ্রার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আশেক মাশুকের বিনিদ্র রজনী এমনি ভাবেই কেটে যায়।

গাউসে পাকের অমরবাণী

১। হে আল্লাহর বান্দা! পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, বিষয়-বৈতবে তোমার আকাংখা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত।

২। হে আল্লাহর বান্দা! কেবলমাত্র ইহজগতের চিন্তায় নিমগ্ন থেকোনা। পরজগতের চিন্তা ইহজগতের চিন্তার সাথে একত্র ।

৩। হে আমার মুরীদ! তোমার কোন ভয় নেই। আমি আমার প্রভুর অসংখ্য নেয়ামত লাভ করেছি। তিনি আমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

৪। হে আমার মুরীদ! ভয়ঙ্কর শত্রুকেও ভয় করোনা। কেননা, আমিও ভয়ঙ্কর যুদ্ধবাজ।

৫। প্রত্যেক অলীই এক এক নবীর পদাঙ্ক অনুসারী, আমি হলাম নবী সম্রাট হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসারী।

৬। আমি জাহেরী বাতেনী জ্ঞানার্জন করে কুতুব হয়েছি। মহা মনিব আল্লাহর নিকট থেকে আমি এই মহা সৌভাগ্য লাভ করেছি।

৭। দুনিয়ার সকল কুতুব ও অলীগণের উপর আল্লাহ আমাকে বাদ্‌শাহ বানিয়েছেন। সুতরাং সকল অলীর উপর আমার কর্তৃত্ব কার্যকর থাকবে।

৮। মাস এবং যুগ আমার নিকট বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব ঘটনাবলী ব্যক্ত করে যায়। সুতরাং এ নিয়ে খামাখা আমার সাথে ঝগড়া করোনা।

৯। আল্লাহ পাকের রাজ্যসমূহের (সৃষ্টিকুল) প্রতি আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম— এগুলো আমার দৃষ্টিতে সরিষার দানার মতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

১০। আল্লাহর সমগ্র মুলুকই আমার রাজ্য। আমার নিকট আমার জনমের পূর্বের হালাতও পরিস্ফুট।

১১। আমি জিলানবাসী। মুহিউদ্দীন আমার পদবী। আমার পতাকাসমূহ উচ্চ পর্বতসমূহের চূড়ায় চূড়ায় শোভা পাচ্ছে।

১২। আমি ইমাম হাসানের (রাঃ) বংশধর। আমার অবস্থান "মাকামে মাখ্‌দায়"। সকল অলীদের গ্রীবাদেশে আমার চরণ যুগল আসন পায়।

১৩। আমার প্রকাশ্য নাম আবদুল কাদের। আমার প্রপিতামহ হচ্ছেন সমস্ত কামালাতের উৎস– হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)।

১৪। "যে ব্যক্তি কোন বিপদে আমাকে আমার নাম ধরে ডাক দিবে, তার বিপদ লাঘব হবে। যে ব্যক্তি কঠিন বিপদে আমার উছিলা দিয়ে সাহায্য চাইবে, তার উক্ত বিপদ হাল্‌কা হবে। যে ব্যক্তি আমার উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে, তার সে মনোবাসনা পূর্ণ হবে"। (বাহ্‌জাতুল আসরার)।

সমাপ্তি স্তুতি

"ছাক্বানিল্‌ হুব্‌বো কাছাতিল- বেছাল"— আপ্‌নি যবাঁ পর্‌ হ্যায়,
ইয়ে হাম্‌ পড়ু–পড়্‌কে পিতে–হ্যায় পেয়ালা - গাউসে আ'জম কা।
"আনাল্‌ জিলী মুহিউদ্দীন–ইছ্‌মি" কা অজিফা হায়,
আজল্‌ ছে ম্যায় বানা হোঁ নাম লেওয়া - গাউছে আ'জম কা।
(দিওয়ান পাক— মেদিনীপুর দরবার শরীফ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

কারামত

সকল অলীদের গ্রীবাদেশে গাউসে পাকের কদম

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর ''নুজহাতুল খাতির" গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

৫৫৯ হিজরী সনে এক মাহফিলে "হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) নিজে ঘোষণা করেছেন ঃ

قَدَمِىْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ اَوْلِيَاءِ اللهِ

অর্থাৎ "আমার এই চরণযুগল সমস্ত অলী-আল্লাহ্‌দের গর্দানের উপর স্থাপিত।" এই ঘোষণার সাথে সাথে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমস্ত অলী-আল্লাহ্‌গণ নিজ নিজ শির নত করে গাউসে পাকের কদমকে নিজেদের গর্দানে স্থাপন করেন। কিন্তু নিজ গর্দানে গাউসে পাকের কদম গ্রহণে অস্বীকৃতি করার কারণে জনৈক ব্যক্তির বেলায়েত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই ঘটনা বর্ণনা করে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উক্ত গ্রন্থে মন্তব্য করেনঃ

وَهٰذَا بَيِّنَةٌ مُبِيْنَةٌ عَلٰى اَنَّهٗ قُطْبُ الْاَقْطَابِ وَالْغَوْثُ الْاَعْظَمُ

অর্থ "উল্লেখিত ঘটনার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনিই কুতুবুল আকতাব ও গাউসুল আজম।"

শেখ জামালুদ্দীনের বর্ণনা

"বাহজাতুল আসরার" প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন (রহঃ) বলেনঃ

অনুবাদঃ "আমি শেখ আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনে আহমদ বস্‌রী (রহঃ) হতে শুনেছি। তিনি তাঁর শেখ আবু তালেব আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ হাশেমী ওয়াসেতী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। শেখ আবু তালেব বলেনঃ আমি বসরায় শেখ জামালুদ্দীন আবু মোহাম্মদ ইবনে আরদ বস্‌রী (রহঃ)কে বলতে শুনেছি, শেখ জামালুদ্দীন (রহঃ) কে "হযরত খিজির (আঃ) এখনও জীবিত আছেন কিনা?" এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেনঃ আমি খিজির আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করে কথা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) সম্পর্কে জানতে চাই। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম আমাকে বললেনঃ "আবদুল কাদের বর্তমানে আল্লাহর সমস্ত মাহবুব বান্দাগণের মধ্যে একক এবং সমস্ত অলীগণের কুতুব বা সর্দার। আল্লাহ তায়ালা কোন অলীকে কোন উচ্চাসনে সমাসীন করেননি, যার চেয়ে অধিক উচ্চাসন (আলা মাকাম) শেখ

আবদুল কাদের জিলানীকে দেয়া হয়নি। কোন প্রিয় বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা আপন মহব্বতের শরবত পান করাননি, যার চেয়ে মধুরতম শরবত আবদুল কাদের পান করেননি। আল্লাহ তায়ালা কোন নিকটতম বান্দাকে এমন অবস্থা দান করেননি, যার চেয়ে উচ্চতম অবস্থা শেখ আবদুল কাদেরকে দান করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরে এমন গোপন রহস্য আমানত রেখেছেন, যার মাধ্যমে তিনি সমস্ত অলী-আল্লাহ্দের উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা অতীতে যতজনকে বেলায়েত দান করেছেন এবং ভবিষ্যতেও কেয়ামত পর্য্যন্ত দান করবেন, তাঁরা সবাই হযরত গাউসুল আজমের দরবারে আদব রক্ষা করে চলেছেন।" (বাহ্জাতুল আসরার)।

শেখ আবু সউদ ও শেখ আবদুল গনির বর্ণনা

ইমাম আলী শাফেয়ী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ আবুল মা'আলী সালেহ্ ইবনে আহ্মদ মালেকী (রহঃ) দু'জন বিখ্যাত মাশায়েখ- যথাক্রমে আবুল হাসান বাগ্দাদী (রহঃ) ও আবু মোহাম্মদ আবদুল লতিফ বাগদাদী (রহঃ)-এর একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আবুল হাসান বাগদাদী (রহঃ) বলেনঃ আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত শেখ আবু সউদ আহমদ ইবনে আবুবকর হেরেমী আমাদের সামনে ৫৮০হিজরীতে গাউসে পাকের ইন্তিকালের ১৯বৎসর পর বর্ণনা করেছেন এবং আবু মোহাম্মদ (রহঃ) বলেনঃ আমার পীর মুর্শেদ হযরত আবদুল গনী (রহঃ) তাঁর পীর মুর্শেদ শেখ আবু আমর ওসমান হতে (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ "খোদার শপথঃ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু অতীতও ভবিষ্যতের অলী-আল্লাহ্গণের মধ্যে কাউকেই শেখ আবদুল কাদের জিলানীর মত করে সৃষ্টি করেননি। "(নিখুঁত সনদের মাধ্যমে বর্ণিত রেওয়ায়াত)।

ইমাম আবু সাঈদ কালইউবীর বর্ণনা

বাহ্জাতুল আসরার প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন সহি সনদের মাধ্যমে বিখ্যাত ফকিহ্ রিজ্কুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহ্মদ ইব্নে ইউসুফ (রহঃ) হতে, তিনি শেখ সালেহ আবু ইসহাক ইবরাহীম (রহঃ) হতে, তিনি মনসুর হতে, তিনি ইমাম আবু আবদুল্লাহ (রহঃ) হতে অন্য এক উচ্চ সনদের মাধ্যমে শেখ আবুল ফতুহ্ নস্রুল্লাহ বাগদাদী (রহঃ) হতে, তিনি শেখ আবুল আববাস আহমদ (রহঃ) হতে, তিনি শেখ আবুল মোজাফফর (রহঃ) ও ইমাম আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) হতে এবং উপরে উল্লেখিত সকলে শেখ ইমাম আবু সাঈদ কাল্ইউবী (রহঃ)কে বলতে শুনেছেন যে, যখন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এ ঘোষণা দিলেন যে, আমার এই কদম সমস্ত অলী আল্লাহগণের গ্রীবাদেশে স্থাপিত,-তখন আল্লাহ্ তায়ালা গাউসুল আজমের ক্বলবে নূরের তাজাল্লী নিক্ষেপ করেন এবং নবী করিম (দঃ) একদল ফেরেস্তার মাধ্যমে তাঁর জন্য খেলাত বা উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সমস্ত জীবিত অলীগণ স্বশরীরে এবং ইন্তিকাল প্রাপ্ত অলীগণ রূহানীভাবে গাউসুল আজমের খেদমতে উপস্থিত হলেন। সকলের উপস্থিতিতে ঐ উপঢৌকন তাঁকে পরিধান করানো হলো।

ফেরেস্তা ও গায়েবী অলীগণ শূন্যে ভিড় করে দাঁড়ালেন এবং সমস্ত শূন্যলোক তাঁদের দ্বারা ভরপুর হয়ে গেল। সে সময় এমন কোন অলী-আল্লাহ্ ছিলেন না- যাঁরা গাউসুল আজমের উদ্দেশ্যে গ্রীবাদেশ নত করেননি (বাহ্জাতুল আস্রার)।

হায়াতুন্নী (দঃ)-এর হস্ত চুম্বন

"তাফ্রিহুল খাতির ফি মানাকিবে শেখ আবদুল কাদের" গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

"৫০৯ হিজরী সনে ৩৮ বৎসর বয়সে হযরত গাউসুল আজম (রহঃ) হজ্ব উপলক্ষে মদিনা মোনাওয়ারায় গমন করে নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নের দুখানা শে'র আবৃত্তি করলেনঃ

فِى حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِى كُنْتُ اُرْسِلُهَا - تُقَبِّلُ الْاَرْضَ عَنِّى وَهِىَ نَائِبَتِىْ -

وَهٰذِهِ نَوْبَةُ الْاَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ - فَامْدُدْ يَمِيْنَكَ كَىْ تَحْظٰى بِهَا شَفَتِىْ -

অর্থঃ "দূরে অবস্থান কালে আমি আমার রূহ্কে উপস্থিত করতাম, আর সে আমার পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে পবিত্র জমিন চুম্বন করতো।

এখন শরীরের পালা। আমি নিজে স্বশরীরে উপস্থিত হয়েছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুগ্রহ করে ডানহাত মোবারক উপরে তুলে দিন। (চুম্বন করে) আমার ঠোঁট দুটি ধন্য হোক।"

উক্ত কবিতা পংক্তি আবৃত্তি করার সাথে সাথে নবী করিম (দঃ) আপন ডানহাত মোবারক বের করে দেন। হযরত গাউসুল আজম (রহঃ) উক্ত হাত মোবারক চুম্বন করে ধন্য হন। (তাফ্রিহুল খাতির)।

সাইয়্যেদ আহমদ রেফাঈ (রাঃ)-এর ঘটনা

বিঃ দ্রঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি "তানভীরুল মুলক বিরুইয়াতিন নবী ওয়াল মালাক" গ্রন্থে উক্ত ঘটনা ৫৫৫ হিজরীতে শেখ সাইয়েদ আহমদ রেফাঈ (রহঃ)-এর সাথেও ঘটেছিল- বলে উল্লেখ করেছেন। সে সময় হযরত গাউসে পাক (রহঃ) জীবিত ছিলেন এবং বয়স হয়েছিল ৮৪ বৎসর। শেখ রেফাঈ (রহঃ)-এর বয়স ছিল তখন ৫৭বৎসর।

রান্না করা মুরগী জীবিত করা

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আস্আদ ইয়াফেয়ী (রহঃ) "মিরআতুল জিনান" গ্রন্থে বাহ্জাতুল আসরার শরীফের বরাতে লিখেছেনঃ

ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন শাত্নুফী (রহঃ) পাঁচজন বুজুর্গ হতে যথাঃ সাইয়েদ ওমর কমিমানী, সাইয়েদ ওমর বাজজার, সাইয়েদ আবু সউদ, সাইয়েদ আবুল আব্বাস আহমদ ছরছরি, ইমাম তাজুদ্দীন আবু বকর প্রমুখ হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলার পুত্র হযরত গাউসুল আজমের আশেক ছিল। ঐ মহিলা আপন ছেলেকে হযরত গাউসে পাকের খেদমতে নিয়োজিত করে যান। গাউসে পাক উক্ত ছেলেকে সাধনায় ও কঠোর রিয়াজতে লাগিয়ে দেন। একদিন মা ছেলেকে দেখ্তে আসলেন। তিনি ছেলেকে কঠোর সাধনার কারণে এবং রাত্রি জাগরণের কারণে অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্বল দেখতে পেলেন। তিনি আরও দেখলেন, তাঁর ছেলেকে শুধু যবের রুটি খাওয়ানো হচ্ছে। ঐ মহিলা গাউসে পাকের দরবারে হাজির হলেন এবং বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলেন— গাউসে পাক (রহঃ) ঐ সময় মুরগীর গোস্ত দিয়ে খানা খেয়ে হাড়গুলো একটি প্লেটে রেখে দিয়েছেন। মহিলা আদবের সাথে আরজ করলেনঃ হুজুর! আপনি নিজে খাচ্ছেন মুরগী, আর আমার ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন যবের রুটী। একথা শুনে গাউসে পাক (রাঃ) আপন হাত মোবারক উক্ত হাড়ের উপর রেখে বললেনঃ "হে মুরগী! তুমি আল্লাহ্‌র হুকুমে জীবিত হয়ে যাও— যিনি মৃতকে গলিত হাড় থেকে পুনরায় জীবিত করেন"। একথা বলার সাথে সাথে মুরগীটি জীবিত হয়ে ডাক দিতে শুরু করলো। হযরত গাউসে পাক (রাঃ) বললেনঃ "তোমার ছেলে যখন এমন স্তরে পৌঁছবে, তখনই যা চায়-তা খেতে পারবে।"

হাওয়ায় চিলকে দ্বিখন্ডিত করা ও পূনঃ জীবিত করা

বাহ্‌জাতুল আস্‌রার— ৬নং-এ বর্ণিত মাশায়েখগণের বর্ণনাঃ

"একদিন হযরত গাউসে পাকের (রহঃ) ওয়াজের মজ্‌লিশের উপরে একটি চিল এসে চিৎকার করছিল। চিলের চিৎকারে উপস্থিত লোকজনের মনের একাগ্রতা নষ্ট হচ্ছিল। হযরত গাউসুল আজম (রহঃ) বায়ুকে নির্দেশ দিলেন - যেন বায়ু উক্ত চিলকে দু-টুক্‌রো করে দেয়। নির্দেশ মোতাবেক বায়ু চিলকে দু-টুক্‌রো করে ফেলল। চিলের মাথা ও শরীর দু জায়গায় পতিত হলো। ওয়াজ শেষে হযরত গাউসুল আজম (রহঃ) কুরছি থেকে নেমে চিলের টুকুরো দুটি একসাথ করে হাত মোবারক দিয়ে মুছে দিলেন এবং বিছ্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিলটি জীবিত হয়ে সকলের সামনেই উড়ে চলে গেলো" (বাহ্‌জাতুল আস্‌রার ও তরজুমানুস সুন্নাহ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

১২ বৎসর পর নৌকাসহ বরযাত্রী দের পূনঃ জীবন লাভ

তাফ্‌সীরে নাঈমীর গ্রন্থকার সূরা আন্‌আম ৯৯ আয়াতের তাফ্‌সীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

"বাগদাদের এক বিধবা মহিলা তার একমাত্র পুত্র সন্তান সাইয়েদ কবির উদ্দিন ওরফে শাহ্‌ দৌলা-কে বিবাহের জন্য বরযাত্রী সহ নৌকায় প্রেরণ করেন। ফিরতি পথে

প্রবল তুফানে নৌকা নদীতে ডুবে যায় এবং বরযাত্রী সহ মহিলার পুত্র ও পুত্রবধু ডুবে মারা যায়। মহিলা পুত্রও পুত্রবধুর শোকে বিলাপ করতে থাকে এবং নদীর কিনারে বসে পাগলিনীর মত কাঁদতে থাকে। এভাবে ১২বৎসর কেটে যায়। একদিন হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলার করুণ কাহিনী শুনে গাউসে পাকের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে মহিলার পুত্র ও পুত্রবধুসহ বরযাত্রীদের পুনর্জীবনের জন্য দোয়া করেন। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নৌকা বরযাত্রী সহ পানির উপরে ভেসে উঠে। পুত্র ও পুত্রবধুকে ফিরে পেয়ে মহিলা খোদার দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। কিছু দিন পর উক্ত মহিলা মৃত্যু বরণ করলে পুত্র শাহ্‌দৌলা আপন বিবিকে নিয়ে গাউসে পাকের দরবারে হাজির হন এবং স্থায়ীভাবে গাউসে পাকের বাড়ীতে খাদেম হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। একদিন রাত্রে তাহাজজুদের সময় গাউসে পাক অজু করার সময় শাহ্‌দৌলা স্বেচ্ছায় অজুর পানি ঢাল্‌তে থাকেন। পা ধোয়ার পর পা হতে গড়িয়ে পরা ৫ ফোঁটা পানি তিনি তাবারুক হিসাবে পান করে ফেলেন। এটি শরিয়তে বৈধ। নবী করিম (দঃ)-এর ওজুর পানি সাহাবাগণ তাবারুক হিসাবে মাথায়, মুখে ও বুকে মালিশ করতেন বলে হাদীসে প্রমাণ আছে। শাহ্‌দৌলার এহেন ভক্তি দেখে গাউসে পাক দোয়া করলেন— প্রতি ফোঁটা পানির বরকতে যেন আল্লাহ্‌ তাঁকে ১০০ বৎসর হায়াত বাড়িয়ে দেন। আল্লাহর দরবারে এ দোয়া কবুল হলো। গাউসে পাকের ইন্‌তিকালের (৫৬১ হিজরী) ৫০০ বৎসর পর উক্ত শাহ্‌দৌলা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে অবশেষে পাঞ্জাবের গুজরাটে এসে ইন্‌তিকাল করেন ১০৬১ হিজরীতে। তাঁর মাজার এখনও গুজরাটে বিদ্যমান আছে। তাফসীরে নাঈমীর প্রণেতা মুফতী আহ্‌মদ ইয়ার খান (রহঃ) সাহেব তাঁর মাজার জেয়ারত করেছেন বলে তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।

যুগ ও কাল গাউসে পাককে ভবিষ্যতের গায়েবী খবর প্রদান

বাহ্‌জাতুল আস্‌রার শরীফে সহিহ্‌ সনদের সাথে ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন গাউসে পাকের নিম্নলিখিত বাণী উদ্ধৃত করেছেনঃ

مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيَّ وَتَجِيْئُ السَّنَةُ اِلَيَّ وَتُسَلِّمُ عَلَيَّ

وَتُخْبِرُنِيْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهَا وَيَجِيْئُ الشَّهْرُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِيْ بِمَا يَجْرِىْ

فِيْهِ وَيَجِيْئُ الْاُسْبُوْعُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِيْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهِ وَيَجِيْئُ الْيَوْمُ

وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِيْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهِ وَعِزَّةِ رَبِّيْ اِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْاَشْقِيَاءَ

لَيُعْرَضُوْنَ عَلٰى عَيْنَىَّ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ- اَنَاغَائِصٌ فِىْ بِحَارِ عِلْمِ اللّٰهِ وَمُشَاهَدَتِهِ - (بَهْجَةُ الْاَسْرَارْ)

অর্থঃ "প্রতিদিনের সূর্য আমাকে সালাম না দিয়ে উদয় হয়না। বৎসর তার শুরুতেই আমার কাছে এসে সালাম দিয়ে এ বৎসরের ঘটনাবলী অগ্রীম আমাকে জানিয়ে যায়। একই ভাবে, মাস, সপ্তাহ ও দিন আমাকে সালাম দিয়ে ঘটিতব্য ঘটনা বলী আমাকে বলে যায়। আমার প্রতিপালকের শপথ। সকল নেক্‌কার ও বদ্‌কার আমার দৃষ্টিতে পেশ করা হয়। আর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহ্‌ফুজে। আমি আল্লাহ্‌র এলেমের সমুদ্রে ও তাঁর ধ্যানের মধ্যে ডুবে আছি।" (সুতরাং আমাদের অবস্থা সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত রয়েছেন । দলীল উপরে)

গাউসে পাকের উছিলায় বিপদ দূর হয়

বাহ্‌জাতুল আস্‌রার এবং মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর নুজ্‌হাতুল খাতির গ্রন্থে আছে ঃ হযরত গাউসে পাক (রাঃ) বলেনঃ

مَنْ نَادٰى نِىْ بِاسْمِىْ فِىْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ وَمَنْ اِسْتَغَاثَ بِىْ فِىْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِىْ فِىْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ -

অর্থঃ "যে কোন ব্যক্তি মুসিবতে পড়ে আমাকে নাম ধরে ডাক্‌বে, তাঁর বিপদ দূর হয়ে যাবে। আর যে কোন ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে আমার উসিলা ধরে সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার বিপদ খোলাসা হয়ে যাবে। আর যে কোন ব্যক্তি আমার উসিলা ধরে কোন মনোবাসনার জন্য দোয়া করবে, তার মনোবাসনাও পূর্ণ হয়ে যাবে।"

উক্ত রেওয়ায়াত বর্ণনা করে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উহার কার্যকারিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেনঃ

وَقَدْ جُرِّبَ ذٰلِكَ مِرَارًا فَصَحَّ

অর্থঃ "ইহা বহুবার পরীক্ষা করে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।" (নুজ্‌হাতুল খাতির ৬১ পৃষ্ঠা ও আল্‌-বাসায়ের পৃষ্ঠা-৫০।

তাক্‌দীর পরিবর্তনে গাউসে পাকের ক্ষমতা

হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রহঃ) স্বীয় মক্‌তুবাত শরীফের প্রথম জিল্‌দ্‌ ২২৪ পৃষ্ঠায় ২১৭ নং মক্‌তুবে লিখেন ঃ

(অনুবাদ) "এমন তক্‌দীর যা লওহে মাহ্‌ফুজে অপরিবর্তনশীল হিসাবে লিখা আছে। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় পরিবর্তনও হতে পারে-বলে আল্লাহ্‌র এলেমে আছে। এ ধরনের তক্‌দীরের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অলৌকিক শক্তি আল্লাহ্‌ পাক গাউসুল আ'জম মহিউদ্দিন আব্‌দুল কাদের জিলানী (রাঃ) কে দান করেছেন"। সূত্রঃ তাবলীগ পত্রিকা শর্ষিনা ১৯৭০ ইং মে সংখ্যা)।

কেয়ামত পর্যন্ত সকল অলী গাউসে পাকের মুখাপেক্ষী

উক্ত কিতাবের ৩য় জিল্‌দ্‌ ১২৩ নং মক্‌তুবে হযরত মোজাদ্দেদ (রহঃ) বলেনঃ

(অনুবাদ) "হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর জামানা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত আউলিয়া আব্‌দাল, আক্‌তাব, আওতাদ, নোকাবা, নোজাবা, গাউস অথবা মুজাদ্দেদ-এর আবির্ভাব হবে, তাঁরা সকলেই তরিকতের ফয়েজ, বরকত ও বেলায়েত অর্জনের বেলায় তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর মাধ্যম বা অছিলা ছাড়া কেয়ামত পর্যন্ত কোন ব্যক্তি অলী হতে পারবে না"। (সূত্রঃ ঐ)

গাউসে পাক বেলায়েত গগনের সূর্য এবং অন্যরা চন্দ্রতুল্য

মক্‌তুব নং ১২৩ তৃতীয় জিল্‌দ-এ উল্লেখ আছে— "হযরত গাউসুল আ'জম (রাঃ) হচ্ছেন সূর্য, আর আমি হলাম চাঁদ সমতুল্য। আমি তাঁর নায়েব ও তাঁর আলোকে আলোকিত। (সূত্রঃ ঐ)

জন্ম দিনে রমজানের রোজা পালন

মানাক্বেবে গাউসিয়াহ্‌ গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

হিজরী ৪৭১ সনের শাবান মাসের ২৯ তারিখ দিনগত রাতে সুব্‌হে সাদেকের পূর্বে হযরত গাউসুল আজম (রাঃ) ভূমিষ্ট হন। ভূমিষ্ট হওয়ার পর মাত্র একবার তিনি মায়ের দুধ পান করেন। তারপরই সুব্‌হে সাদেক আরম্ভ হয় এবং মসজিদে আজান হয়। এরপর হতে তিনি মায়ের দুধপান বন্ধ করে দেন। মা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) বহু চেষ্টা করেও নিজের বা ছাগলের দুধ পান করাতে পারলেন না। দিনের শেষে সূর্যাস্তের পর তিনি পুনরায় দুধ পান শুরু করেন। বুদ্ধিমতি মা এ ঘটনায় কিছুটা আঁচ করতে পারলেন।

শাবানের ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখার নিয়ম আছে। এটা ওয়াজিব কেফায়া। অর্থাৎ কিছু লোকে চাঁদ অনুসন্ধান করলে সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়। ঐ দিন জিলান শহর ও আশেপাশের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তাই কেউই চাঁদ দেখেনি। পরদিন সাধারণ লোক রমজানের রোজা রাখা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু বিশিষ্ট লোকেরা নফল নিয়তে রোজা রাখেন। হযরত গাউসুল আজমের পিতা মাতাও নফল নিয়তে রোজা রাখেন। পরদিন অন্যান্য স্থান থেকে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ২৯শে সাবানেই রমজানের চাঁদ দেখা গিয়েছে। আর হযরত বড়পীর আবদুল কাদের

জিলানী (রাঃ) মাতৃগর্ভে থেকেই আকাশের চাঁদ দেখেছিলেন এবং পরদিন রোজা রেখেছিলেন। জিলান শহরের লোকজন গাউসুল আজমের জন্মের প্রথম দিনের কারামত দেখে হতবাক হয়ে যায়। হযরত বড়পীর সাহেব (রাঃ) বলেন ঃ আমার দৃষ্টি শুধু আকাশে নয়— লওহে মাহ্ফুজেও। বাহ্জাতুল আস্রার নামক আরবী গ্রন্থে নূরুদ্দীন আবুল হাসান শাত্নুফী (রহঃ) গাউসুল আজমের নিম্নের বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

বিশ্বজগতের ঘটনাবলী অলীগণের দৃষ্টিতে

وعزة ربى ان السعداء والاشقياء ليعرضون على عينى فى اللوح المحفوظ

অর্থ্যাৎঃ আমি আমার প্রতি পালকের ইজ্জতের শপথ করে বলছি– সমস্ত নেক্কার ও বদ্কার আমার দৃষ্টিতে পেশ করা হয়ে থাকে। আমার দৃষ্টি লওহে মাহফুজে নিবদ্ধ। লাওহে মাহ্ফুজ আমার আয়নাস্বরূপ–বাহ্জাতুল আস্রার।

মাওলানা জালালুদ্দীন রমী (রহঃ) মস্নবী শরীফে বলেছেন

لوح محفوظ ست پیش اولیاء + انچه محفوظ است محفوظ ازخطا –

অর্থ ঃ লওহে মাহ্ফুজ আল্লাহ্র অলীগণের দৃষ্টিসীমানায়। লওহে মাহ্ফুজে সংরক্ষিত সব কিছুই ভুলভ্রান্তি হতে নিরাপদ। সুতরাং অলীগণের দৃষ্টিও নির্ভুল।

হযরত গাউসুল আজমের এই চাঁদ দর্শনের কারামতটি গানেও গজলে সকলের নিকটই অতি পরিচিত।

"রমজানের প্রথম রাতে তোমার শুভ জন্ম হয়,
দিনের বেলায় খাওনা দুধ গো–তাতে তোমার রোজা হয়,
কেউ জানেনা চাঁদের খবর — জানে গাউসে ছাম্দানী।
তোমারি নামের গুণে আগুন হয়ে যায় পানি।"

কসিদায়ে গাউসিয়ায় হযরত বড়পীর সাহেব (রাঃ) বলেন ঃ

نظرت الى بلاد الله جمعا + كخردلة على حكم اتصال –

অর্থ ঃ "আমি (আবদুল কাদের) খোদার রাজ্যসমূহের প্রতি নজর করে দেখি— ঐগুলি আমার হাতের তালুতে রক্ষিত রাই বা সরিষার দানার মত দেখা যায়"।

কারামাতে আউলিয়া হচ্ছে মোজেজায়ে আম্বিয়ারই ফসল। ইসলামী আকিদা মতে কারামতে আউলিয়া হক ও সত্য। মৃত্যুর পরেও উক্ত কারামত বিদ্যমান থাকে— বরং বৃদ্ধি পায়। (ইমাম গাজজালী)।

মাতৃ গর্ভে ১৮ পারার হাফেজ ঃ

আল্লামা মোহাম্মদ ছাদেক (আগ্রা) স্ব-প্রণীত কিতাবে নিম্ন বর্ণিত ঘটনাটি লিখেছেনঃ

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর আম্মাজান ছিলেন ১৮ পারার হাফেজা। ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর বংশের বিখ্যাত ওলী হযরত ছৌমেয়ী (রহঃ)-এর কন্যা তিনি। ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশের ওলী হযরত আবু সালেহ্ মুছা জঙ্গীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। দীর্ঘদিন পর মায়ের ৬০ বৎসর বয়সের সময় হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। শিশুকালে দেশের প্রথা মোতাবেক তাঁকে জিলান শহরের একটি মক্তবে ভর্তি করা হয়।

ওস্তাদজী সর্ব প্রথম তাঁকে "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" ছবক দেন। শিশু আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) বিছমিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ সুরা পাঠ করে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। ওস্তাদজী ও ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবন করতে লাগলেন এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন। এভাবে ১৮ পারা শেষ করে বড়পীর সাহেব থেমে গেলেন। ওস্তাদ সাহেব-এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বড়পীর সাহেব বললেনঃ আমার আম্মাজান ১৮ পারার হাফেজা। আমাকে গর্ভে ধারণ করার পর তিনি প্রতিদিন নিয়িমিতভাবে ১৮ পারা মুখস্ত তিলাওয়াত করতেন। আমি তাঁর মুখে শুনে শুনে হিফজ করে ফেলেছি। এমনিতেই ১৮ পারা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে গেছে। (মোজেজায়ে আম্বিয়া ও কারামাতে আউলিয়া)। গাউসে পাক (রাঃ) মাদারজাদ ওলী ছিলেন। এটি তাঁর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন কারামত।

বাঘের সুরতে ভন্ড ফকির হত্যা ও মায়ের আব্রু রক্ষা

মানাক্বেবে গাওসিয়াহ্ গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

একদিন হযরত বড়পীর সাহেবের আম্মাজান কোন কারণে রাগান্বিত হয়ে পুত্রকে বলেছিলেন- তোমার শিশুকালে তোমার জন্য আমি কত কষ্ট করেছি— সে কথা কি তোমার মনে আছে? হযরত বড়পীর সাহেব উত্তর দিলেনঃ হাঁ! তার পূর্বের কথাও মনে আছে। আপনার গর্ভে থাকতে আমি আপনার কি উপকার করেছি, সেকথা কি আপনার মনে আছে? আম্মাজান আশ্চার্যান্বিতা হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কখন আমার কি উপকার করেছিলে? তখন হযরত বড়পীর সাহেব একে একে ঘটনাটি খুলে বলতে লাগলেন। শুনুন আম্মাজান! আমি যখন আপনার গর্ভে ছিলাম, তখন একজন ভিক্ষুক এসে কিছু ভিক্ষা চায়। ঘরে কেউ ছিল না। আপনি একা ছিলেন। ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক বার বার খাদ্য চেয়েও যখন কোন সাড়া শব্দ পেল না, তখন সে একথা বলে আক্ষেপ করতে করতে চলে যাচ্ছিল— "হায়! আজ বোধহয় ক্ষুধার জ্বালায় মরেই যাব"।

একথা শুনে আপনার হৃদয় গলে যায়। আপনি ভিক্ষুককে খুব নীচুস্বরে বলেছিলেনঃ বাবা বারান্দায় গিয়ে বসো। আমি তোমাকে কিছু খাবার দিচ্ছি। এ বলে আপনি পর্দার অন্তরাল থেকে কিছু খাবার আগাইয়া দিলেন। খানা খেয়ে উক্ত ভিক্ষুকের মনে শয়তানী খেয়াল চাপে। সে কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অন্দর মহলের দিকে পা বাড়ায়। অমনি একটি গায়েবী বাঘ এসে উক্ত ভিক্ষুককে থাবা মেরে সংহার করে ফেলে। আপনার ইজ্জত আব্রু ঐ দিন আল্লাহ্ তায়ালা এমনিভাবে রক্ষা করেন। আপনি কি জানেন– ঐ ব্যাঘ্রটি কে ছিল? আমি আবদুল কাদের জিলানীর রূহ্ ঐ দিন আপনার গর্ভ হতে ব্যাঘ্র সুরত ধারণ করে ঐ ফকিরকে সংহার করেছিল। দশ বৎসর পর পুত্রের মুখে এ কথা শুনে মা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং বুঝতে পারলেন— তিনি একজন রত্নগর্ভা—। (মোজেজায়ে আম্বিয়াও কারামাতে আউলিয়া থেকে ভাষান্তর)

বেহেস্তি ও দোজখীদের জুতা পৃথক করা

হযরত গাউসুল আজমের পিতা সৈয়দ আবু সালেহ্ মুছা জঙ্গী (রহঃ) জিলান শহরের এক মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। হযরত বড়পীর সাহেব একদিন পিতার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্য জিদ ধরলেন। অগত্যা পিতা তাঁকে সাথে নিয়ে মসজিদে গেলেন। কিন্তু শিশু বলে তাঁকে সকলের পিছনে বসালেন। মুসল্লীগণ আপন আপন জুতা মসজিদের বাইরে রেখে গেলেন। নামাজ শুরু হলো। হযরত বড়পীর সাহেব এ সুযোগে বাইরে এসে জুতাগুলোকে দু'ভাগ করে সাজিয়ে রাখলেন। নামাজ শেষে মুসল্লীগণ খোঁজা খুঁজী শুরু করলেন। অবশেষে উক্ত দুটি স্তুপ থেকে জুতা খোঁজ করে পেলেন এবং শিশু আবদুল কাদেরের খামখেয়ালীর জন্য মৃদু সমালোচনা আরম্ভ করলেন। এ অবস্থা দেখে পিতা আবু সালেহ সাহেব গোস্বায় হযরত বড়পীর সাহেবকে চপেটাঘাত করলেন। হযরত বড়পীর সাহেব বললেনঃ আব্বাজান! আমি তো কোন খারাপ কাজ করিনি। আমি দেখ্ছি— বেহেস্তি এবং দোজখী উভয় প্রকারের লোকের জুতা এক সাথে আছে। তাই সযত্নে বেহেস্তিদের জুতা একস্থানে এবং দোজখীদের জুতা অন্য স্থানে পৃথক করে রেখেছি। এতে আমার এমন কি অন্যায় হয়েছে? একথা শুনে উপস্থিত লোকজন হতবাক হয়ে যায় এবং বলাবলি করতে থাকে-এ শিশু একদিন নিশ্চয়ই উঁচু মর্যাদার ওলী হবেন। (প্রাগোক্ত কিতাব)।

গাউসুল আজমের প্রথম মুরীদ

বাহ্জাতুল আস্রার গ্রন্থে বড়পীর সাহেব নিজেই নিম্নোক্ত ঘটনাটি বলেছেন ঃ হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর পিতা বৃদ্ধ বয়সে তাঁর শৈশব কালেই ইনতিকাল করেন। ৭৮ বৎসরের বৃদ্ধা আম্মাজান হযরত বড়পীর সাহেবের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। দেশের মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে বাগদাদে উচ্চ শিক্ষার জন্য পুত্রকে প্রেরণের মনস্থ করলেন। তখন হযরত বড়পীর সাহেবের বয়স ১৮ বৎসর। এক বাণিজ্য কাফেলার সাথে হযরত বড়পীর সাহেব বাগদাদ রওনা হলেন।

মা ৪০ টি স্বর্ণমুদ্রা বড়পীর সাহেবের জামার বগলের নীচে সেলাই করে দিলেন। বিদায়লগ্নে বৃদ্ধা মা বললেন ঃ বৎস! আপদে বিপদে সব সময় সত্য কথা বলবে, কোনদিন মিথ্যা কথা বলবেনা! হযরত বড়পীর সাহেব মায়ের কদমবুচি করে কাফেলার সাথে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। মায়ের সাথে এই তাঁর শেষ দেখা। পথিমধ্যে এক জায়গায় কাফেলার উপর ডাকাতদল আক্রমণ করে বসলো। বণিকদের মাল সম্পদ-টাকা পয়সা লুট করে অবশেষে হযরত বড়পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো— হে বালক! তোমার নিকট কোন টাকা পয়সা আছে কি? তিনি নির্ভয়ে উত্তর দিলেনঃ হাঁ! আমার নিকট ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা আছে। ডাকাতদল বললোঃ কোথায় আছে! বড়পীর সাহেব বললেনঃ আমার বগলের নীচে। ডাকাতদল খোঁজ করে স্বর্ণমুদ্রা পেলো। তারা হযরত বড়পীর সাহেবকে তাদের সর্দারের নিকট নিয়ে গেলো। ডাকাত সর্দার বললোঃ বৎস! তুমি কেন মূদ্রার কথা বললে? না বললে তো তোমাকে কেউ তল্লাসী করতোনা! হযরত বড়পীর সাহেব বললেনঃ আমার আম্মাজান আমাকে সব সময় সত্য কথা বলার উপদেশ দিয়েছেন। আমি কিভাবে মিথ্যা কথা বলবো? একথা শুনার সাথে সাথে ডাকাত সর্দারের মনের ভাবের পরিবর্তন হতে লাগলো। সে মনে মনে ভাবতে লাগলোঃ হায়! এই বালক তাঁর মায়ের আদেশ এ ঘোর বিপদেও লঙ্ঘন করেনি! আর আমরা খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে চলেছি! ধিক্ আমাদের জীবনের উপর। এ কথা বলেই উক্ত ডাকাত সর্দার হযরত গাউসুল আজমের পায়ে লুটিয়ে পড়লো এবং তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গেলো। তার দেখাদেখি ৬০ জনের ডাকাত দলও তৌবা করলো এবং বাণিজ্য কাফেলার লুণ্ঠিত মাল ফেরত দিয়ে দিল।

কথিত আছেঃ এই ডাকাত দলই হযরত গাউসুল আজমের প্রথম মুরীদ! তাঁরা পরবর্তীকালে সকলেই এক একজন ওলী হয়েছিলেন। মায়ের একটি আদেশ পালন করার বরকতেই আল্লাহ তায়ালা হযরত গাউসুল আজমের মাধ্যমে একটি ডাকাতদলকে হেদায়াত দান করেছেন। যুবক ভাইদের জন্য এটি একটি বড় শিক্ষা। "মায়ের পদতলে বেহেস্ত"— হাদীসের এই বাণী হযরত বড়পীর সাহেব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন এবং এর বরকতেই এতবড় একটি ডাকাত দলকে তিনি হেদায়াত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পিতা মাতার নির্দেশ পালনের মধ্যে আল্লাহ্র অজস্র নেয়ামত পাওয়া যায়। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে পিতা মাতার বাধ্যগত সন্তান হওয়ার তৌফিক দিন! আমিন।

এক ওলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রাপ্তি

মোল্লা আলী ক্বারী "নুজ্হাতুল খাতির" গ্রন্থে লিখেন ঃ ইমাম আবদুল্লাহ্ ইব্নে আলী আমিমী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন— আমি যুবক বয়সে বাগদাদে উচ্চ শিক্ষার জন্য গমন করি। মাদ্রাসায়ে নেজামিয়ায় আমার এক ঘনিষ্ট সহপাঠী ছিলেন। তাঁর নাম ইবনে ছাক্কা। আমরা উভয়ে ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি বুজুর্গ ওলীগণের দরবারে যাতায়াত করতাম। ঐ সময়ে বাগদাদ নগরীতে একজন ওলীকে লোকেরা গাউস বলতো। ঐ

গাউসের একটি মশহুর কারামাত এই ছিল যে, তিনি যখন ইচ্ছা করতেন— হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। আবার ইচ্ছা করলে ইঠাৎ দৃশ্যমান হয়ে যেতেন।

একদিন আমি (আবদুল্লাহ তামিমী), ইবনে ছাক্কা এবং যুবক আবদুল কাদের জিলানী - এই তিনজন উক্ত গাউসের সাথে দেখা করতে গেলাম। পথিমধ্যে ইবনে ছাক্কা বললোঃ আমি এই গাউস সাহেবকে এমন একটি প্রশ্ন করবো— যার জওয়াব দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি (আবদুল্লাহ) বললামঃ আমিও একটি প্রশ্ন করবো। দেখি তিনি কি জওয়াব দেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী বললেনঃ নাউজুবিল্লাহ! আমি তাঁকে কি প্রশ্ন করবো? আমি শুধু তাঁর দীদারের বরকত লাভের প্রতীক্ষা করতে থাকবো।

ইমাম আবদুল্লাহ বলেনঃ আমরা তিনজন উক্ত গাউস সাহেবের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম— তিনি আপন আসনে নেই। আসনটি খালি। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম- তিনি উক্ত আসনে উপবিষ্ট। তিনি ইবনে ছাক্কার দিকে কড়া দৃষ্টিতে নজর করে বললেনঃ "হে ইবনে ছাক্কা! তোমার বিনাশ হোক। তুমি আমাকে অমুক প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতে চাও, যার জওয়াব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নাও, তোমার প্রশ্ন এই এবং উত্তর এই। আমি তোমার মধ্যে কুফরীর অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হতে দেখতে পাচ্ছি"। তারপর আমার দিকে নজর করে বললেনঃ "হে আবদুল্লাহ! তুমি মনেমনে খেয়াল করেছো- তুমি আমাকে একটি প্রশ্ন করবে আর আমি কি উত্তর দেই— তা তুমি দেখবে। নাও! তোমার প্রশ্ন এই এবং উত্তর এই। দুনিয়া তোমার উপর এমন ধূলা নিক্ষেপ করবে যে, তুমি তাতে আকর্ণ ডুবে যাবে। এটা তোমার বেয়াদবীর প্রতিদান"। তারপর ঐ গাউস সাহেব হযরত আবদুল কাদের জিলানীর দিকে নজর করলেন এবং কাছে নিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বললেনঃ "হে আবদুল কাদের! আপনি উত্তম শিষ্টাচারের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুলকে সন্তুষ্ট করে ফেলেছেন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি- আপনি বাগদাদের মঞ্চে ওয়াজের কুরছিতে উপবিষ্ট হয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন— "আমার এই কদম সমস্ত আউলিয়াদের কাঁধে। আপনার ঘোষণার সাথে সাথে যুগের সমস্ত আউলিয়া নিজ নিজ গ্রীবাদেশ নত করে দিয়েছেন"। (এই ঘটনা গাউসে পাকের ঘোষণার বহু পূর্বের)।

একথা বলেই সে গাউস হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানীর ব্যাপারে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর আলামত অচিরেই প্রকাশ পেয়ে গেলো। তিনি এখন বাগদাদের মঞ্চে ও মাহফিলে অসংখ্য লোকের জমায়েতে ওয়াজ করছেন এবং ঘোষণা দিচ্ছেন— আমার এই বেলায়েত ও গাউসিয়তের কদম সমস্ত ওলীদের গ্রীবাদেশে। আর সমস্ত অলীগণ নিজ নিজ গর্দান নত করে তা স্বীকার করে নিচ্ছেন।

আর ইবনে ছাক্কার অবস্থা বর্তমানে এমন দাঁড়িয়েছে যে, সে এক খৃষ্টান রাজার সুন্দরী মেয়ের উপর আসক্ত হয়ে পড়েছে। উক্ত মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে

খৃষ্টান রাজা শর্ত জুড়ে দেন যে, যদি ইবনে ছাক্কা ইসলাম ধর্ম ছেড়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে বিবাহ হতে পারে। ইবনে ছাক্কা উক্ত শর্ত গ্রহণ করে মেয়ের জন্য খৃষ্টান হয়ে যায়। আর আমি আবদুল্লাহর অবস্থা? কোন কার্য উপলক্ষে আমাকে একবার দামেস্কে যেতে হয়েছিল। তথাকার সুলতান নূরুদ্দীন শহীদ আমাকে ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ের প্রধান নিয়োগ করলেন। দুনিয়ার প্রাচুর্য্য এসে আমাকে আকর্ণ ডুবিয়ে দিলো। আমি দুনিয়াদার হয়ে গেলাম। উক্ত গাউসের কথা আমাদের তিনজনের বেলায় অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। — (নুজ্‌হাতুল খাতির)

বায়ুর উপর আধিপত্য ঃ দূরদেশ থেকে বড়পীর সাহেবের ওয়াজ শ্রবণ

হযরত বড়পীর সাহেবের জমানায় (৪৭১-৫৬১ হিজরী) বিজ্ঞানের তেমন উন্নতি সাধিত হয়নি। বায়ু, ঈথার— ইত্যাদি সম্পর্কে তখন গবেষণাও শুরু হয়নি। এমতাবস্থায় হযরত বড়পীর সাহেবের (রাঃ) বাগদাদে প্রদত্ত ওয়াজ নসিহত নিয়মিতভাবে মোসেলের অধিবাসীগণ শুনতে পেতেন। মোসেল বাগদাদ শরীফ থেকে উত্তর দিকে ৫০০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। মোসেলের একজন ওলী হযরত আদি বিন মুসাফির (রহঃ) হযরত বড়পীর সাহেবের মুরীদ ছিলেন। তিনি অনেক দিন বাগদাদে অবস্থান করে হযরত গাউসে পাকের ওয়াজ নসিহত শ্রবণ করেন। গাউসে পাক সপ্তাহে তিন দিন বাগদাদের তিন জায়গায় ওয়াজ করতেন। ঐ সব মাহ্‌ফিলে লক্ষ লোকের সমাগম হতো। নিকটের ও দূরের সকলেই হুজুরের বক্তৃতা সমানভাবে শুনতে পেতেন। মোসেল নিবাসী উক্ত আদি বিন মুসাফির (রহঃ) একদিন আরজ করলেনঃ হযরত; আমার দেশে যাওয়া দরকার। কিন্তু আপনার ওয়াজ নসিহত শোনার জন্য মন যেতে চায় না। হযরত বড়পীর সাহেব বললেনঃ তুমি দেশে চলে যাও। আমার ওয়াজের নির্ধারিত দিনে ও সময়ে তুমি মোসেলবাসীদের নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে একজায়গায় বসে যাবে। জামায়েত স্থানের চতুর্দিকে লাঠি দিয়ে একটি কুন্ডলী (বৃত্ত) দাগ দিবে। তারপর প্রত্যেক শ্রোতা মাথায় একটি রুমাল দিয়ে এক ধেয়ানে বসে যাবে। ইন্‌শা-আল্লাহ্ মোসেল থেকেই তোমরা আমার বাগদাদের বক্তৃতা শুনতে পাবে।

হযরতের উপদেশ মোতাবেক আদি বিন মুসাফির (রহঃ) তাঁর ভক্তদের নিয়ে মোসেলের একটি পর্বতের পাদদেশে বসে বসে গাউসে পাকের ওয়াজ শুনতে পেতেন। হযরত আদি বিন মুসাফির (রহঃ) বলেনঃ আমাদের মনে হতো - যেন গাউসে পাক আমাদের মাথার উপর মেঘমালায় বসে বসে ওয়াজ করছেন। সুবহানাল্লাহ!

আওয়াজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌছার মাধ্যম হচ্ছে বায়ু ও ঈথার। ঈথারের তরঙ্গে আওয়াজ পৌছিয়ে দিলে ঈথার তরঙ্গ এক মুহূর্তে ঐ আওয়াজ বিশ্বময় পৌছিয়ে দেয়। ইহাই বর্তমান বিজ্ঞানের অবদান। কিন্তু এখন থেকে ৯০০ বৎসর পূর্বে গাউসে পাক ঈথারের উপর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে রাজত্ব করে গেছেন। আল্লাহর অলীগণের প্রতি খোদার বিশ্বজগত নত ও বাধ্য। ওলীগণের আধ্যাত্মিক শক্তি ঈথারের শক্তির চাইতেও অধিক শক্তিশালী। ইহা আল্লাহরই কুদরত।

গায়েবী ওড়নার আগমন

একদিন হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) ওয়াজ করতে করতে খোদা প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তিনি জজ্‌বা হালতে এমন তেজস্বীতার সাথে ওয়াজ করতে ছিলেন যে, হঠাৎ তাঁর মাথা হতে পাগড়ীখানা মাটিতে পড়ে যায়। এতদ্দর্শনে সভায় উপস্থিত সকলেই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নিজ নিজ মস্তক হতে পাগড়ী খুলে তাঁর পাগড়ীর নিকটেই রেখে দিলেন। ওয়াজ শেষে হযরত গাউসুল আজম (রাঃ) নিজ পাগড়ীখানা তুলে মাথায় দিলেন। লোকজনও আপন আপন পাগড়ী তুলে নিয়ে মাথায় ধারণ করলেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সকলে লক্ষ্য করলেন যে, মহিলার মাথার একখানা ওড়না সেখানে পড়ে আছে। অথচ উক্ত মাহফিলে কোন মহিলা উপস্থিত ছিলনা। তবে এ ওড়নাখানা কোথা থেকে কি করে এখানে আসলো? সবাই একথা বলাবলি করছেন। এমন সময় দেখা গেল যে, হঠাৎ করে ওড়নাখানা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

একজন ভক্ত হযরত গাউসে পাককে জিজ্ঞেস করলেন— হুজুর! ঐ ওড়নাখানা কার এবং কোথা হতে আসলো? আবার গায়েব হয়ে গেলই বা কোথায়? হযরত বড়পীর সাহেব উত্তর করলেনঃ "বাগদাদের শহরতলী এলাকায় একজন মহা তাপস্বিনী মহিলা আছেন। সে নিজ বাড়ীতে বসেই আমার ওয়াজ শুনছিল এবং দেখছিল। আমার পাগড়ী পড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তোমরা যখন নিজ নিজ পাগড়ী খুলে এখানে রাখছিলে, তখন উক্ত মহিলাও আমার সম্মানে তার মাথার ওড়না খানা খুলে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার আমি যখন আমার পাগড়ী তুলে নিলাম— ঐ ওড়নাখানাও তার নিকট চলে গেল"। (মোজেজায়ে আম্বিয়া ও কারামাতে আউলিয়া)। ইয়েমেনের রানী বিলকিসের সিংহাসন এক পলকে যেভাবে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে নিয়ে এসেছিলেন আল্লাহর ওলী আসেফ বিন বরখিয়া। হযরত গাউছে পাকের এই কারামতটিও তদ্রূপ।

চোরকে কুতুবে পরিণত করা

পবিত্র বাগদাদ নগরীতে এক পাকা চোর ছিল। কোন দিন সে ধরা পড়েনি। সে বহু আমির উমরাহের বাসায় চুরি করেছে। কিন্তু কোন দিন কেউ তাকে ধরতে পারেনি। সে মনে মনে খেয়াল করলোঃ হযরত বড়পীর সাহেবের নিকট অনেকেই মূল্যবান হাদিয়া নিয়ে আসে। তাঁর ঘরে চুরি করতে পারলেই একরাত্রে বড়লোক হয়ে যেতে পারবো।

সত্যিই সে একদিন গভীর রাতে হযরত গাউসে পাকের ঘরে ঢুকলো। তখন বড়পীর সাহেব ঘরের এক কোণে রাত্রির ইবাদত ও মোরাকাবায় মশগুল ছিলেন। চোর ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে তালাশ করলো। কিন্তু কিছুই পেলনা। অবশেষে নিরাশ হয়ে সে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে চাইলো। কিন্তু দুচোখে কিছুই দেখতে পেলনা। নিরাশ হয়ে সে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে রইলো। আশা! ভোরের আলো দেখা দিলে হয়তো দেখতে পারবে এবং বের হয়ে যেতে সক্ষম হবে। সে ঘরে বসে বসে দুশ্চিন্তা করতে লাগলো।

এমন সময় হযরত খিজির আলাইহিস সালাম ঘরে প্রবেশ করে হযরত বড়পীর সাহেবকে বললেনঃ আজ নেহাওন্দ (ইরান) শহরের কুতুব ইনতিকাল করেছেন। আপনি আজ রাত্রের মধ্যেই একজনকে ঐ শহরের কুতুব নিয়োগ করে পাঠিয়ে দিন। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, গাউস, কুতুব, আবদাল, আওতাদ, আবরার শ্রেণীর আউলিয়াগণের নিয়োগদান হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর অধীনে ন্যাস্ত। তাঁরই অনুমোদনক্রমে তাঁর নীচের গাউস এবং কুতুবুল আকতাবগণও নিয়োগদান করতে পারেন। কেয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র গাউসুল আজম হচ্ছেন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)। একথা লিখেছেন মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) নুজহাতুল খাতির গ্রন্থে যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যাক, হযরত বড়পীর সাহেব তাঁর খাদেমকে ডেকে বললেন ঃ "আমার ঘরের কোণে একজন লোক চুপ করে বসে আছে। তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো"। খাদেম লোকটিকে ধরে নিয়ে আসলো। চোর ভয়ে থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করলো। সে কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগলোঃ হুজুর! আমি চুরি করে কোন দিন ধরা পড়িনি। আজ আপনার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। আমাকে ক্ষমা করুন! কোনদিন আর চুরি করবোনা!

দয়ার সাগর হযরত গাউসুল আজম (রাঃ) বললেনঃ তুমি আমার ঘরে বড় আশা করে ঢুকেছো। তোমাকে খালী হাতে বিদায় দিতে আমার শরম লাগে। এসো! কাছে এসো! আজ তোমাকে এমন দৌলত দেয়া হবে, যা তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বাদ্‌শাহ বানিয়ে দেবে।

অতঃপর গাউসে পাক চোরকে তওবা করায়ে এমন জামালী ফয়েজের দৃষ্টি দিলেন যে, এক মুহূর্তে সে যাবতীয় মারেফাত তত্ব ও গুপ্ত রহস্যের অধিকারী হয়ে শহর কুতুবে পরিণত হলো। তরিকত ও মারেফাত বিদ্যায় ১০ নম্বর পদে উন্নীত হলে তাঁকে কুতুব বলা হয়। এর উপরে রয়েছে কুতুবুল আকতাবের পদ, এর উপরে আছে গাউসের পদ এবং এর উপরে হলো গাউসুল আজমের স্তর। হযরত গাউসুল আজমের এক ফয়েজের দৃষ্টিতে চোরের ভাগ্য খুলে গেলো। বিনা পরিশ্রমে দোয়ার বরকতে সে কুতুবের মর্যাদা লাভ করলো। তিন প্রকারে বেলায়েত লাভ হয়। যথাঃ (১) বেলায়েতে আতায়ী বা খোদা প্রদত্ত মাদারজাদ অলী, (২) বেলায়েতে ফয়জী বা ফয়েজ প্রাপ্ত অলী, (৩) বেলায়েতে কছবী বা সাধনার বলে অলী। মাওলানা মসনবী রুমী (রহঃ) বলেনঃ

ایك زمانه صحبت با اولیاء + بهتر ازصد سال طاعت بے ریا

অর্থঃ এক মূহুর্ত অলীগণের সান্নিধ্য লাভ করা (হালের সাথে হাল মিশায়ে) শত বৎসরের অকৃত্রিম ইবাদতের চেয়েও অধিক মূল্যবান। কোন আশেক বলেনঃ

نگاه ولی مین یه تا ثیر دیکهی + بدلتی هزارون کی تقدیر دیکهی –

অর্থঃ অলীগণের শুভ দৃষ্টির মধ্যে এমন তাছির দৃষ্ট হয় যে, এক মুহূর্তে হাজারো লোকের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়। এই অধম রচিত 'ঈদে মিলাদুন্নবী' গ্রন্থের শেষের দিকে গাউসে পাকের শানে একটি কবিতায় লিখেছি ঃ

"এক নজরে চোরকে তুমি দিলে কুতুব বানাইয়া,
এই পাপীরে করো দয়া— ও গো দয়াল গাউছিয়া,
সকলেরে দাও গো তুমি— তোমার সে নজর খানী—
তোমারি নামের গুনে আগুন হয়ে যায় পানি"।
সূত্র ঃ শানে হাবীব, হাদায়েকে বখ্শিষ ও অন্যান্য গ্রন্থ।

গাউসে পাকের বাবুর্চির উছিলায় ৭০ জন কুতুবের গায়েবী খানা প্রাপ্তি

হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর একজন বাবুর্চি ছিলেন। ১২ বৎসর যাবৎ তিনি খানা পাকাচ্ছেন। তাঁর চোখের সামনে কতলোক এসে ভাগ্যের পরিবর্তন করলো। চোর কুতুব হলো। নিঃসন্তান সন্তান প্রাপ্ত হলো। মেয়ে ছেলেতে পরিণত হলো। দ্বীন-দুনিয়ার অনুসন্ধানীরা যার যার মক্সুদ পূর্ণ করে নিল। কিন্তু বাবুর্চি সাহেবের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হলো না। তাই তাঁর মনে ক্ষেদ। একদিন মনের ক্ষোভে কাউকে কিছু না বলেই তিনি গাউসে পাকের খান্কা ত্যাগ করে চলে গেলেন। হাটতে হাটতে দুপুর হলো। শরীর অবসন্ন হয়ে আসলো। তিনি পথিমধ্যে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে অবসন্ন দেহে একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। ঘুম এসে গেলো। তিনি ঘুমের ঘোরে দেখতে পেলেন— ৭০ জন কুতুব তাঁর পাশে বসে বলাবলি করছেন— আজ তিন দিন যাবৎ আমাদের ভাগ্যে কোন খানা পিনা জুটেনি। ইনি হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর (রঃ) বাবুর্চি। ১২ বৎসর যাবত গাউসে পাকের ছোহ্বতে রয়েছেন। আসুন, আমরা তাঁর উছিলা দিয়ে খোদার দরবারে খানা প্রার্থনা করি। এই বলে ঐ ৭০ জন কুতুবের সর্দার মুনাজাত ধরলেন, আর সবাই আমিন বলছেন। এমন সময় বাবুর্চি সাহেবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন— একজন লোক বিভিন্ন আইটেমের খানার খাঞ্চা মাথায় করে নিয়ে এসে কুতুবগণের খেদমতে পেশ করলেন। কুতুবগণ বাবুর্চি সাহেবকে তাদের সাথে খানায় শরীক হওয়ার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু বাবুর্চি সাহেব খানা গ্রহণ না করেই পুনরায় গাউসে পাকের দরবারের দিকে ছুটে চললেন। গিয়ে দেখেন— গাউসে পাক তাঁর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাবুর্চিকে দেখে মুচ্কী হাসি দিয়ে গাউসে পাক (রাঃ) বললেনঃ বাবা! অন্যেরা তো আমার মেহমান। তাদেরকে কিছু দিয়ে বিদায় করে দিই। তুমি তো আমার ঘরের লোক! তোমাকে কি আমি বিদায় দিতে পারি? এ কথার তাৎপর্য বুঝে বাবুর্চি বলে উঠলেনঃ হুজুর! যা পেয়েছি এবং যা দেখেছি, এর চেয়ে আর বেশী কি দরকার? অনুগ্রহ করে আমাকে উক্ত খেদমতে পুনরায় কবুল করে নিন! (গাউসুল আজমের জীবনী)।

গাউসেপাকের পোষা কুকুর বাঘকে খেয়ে ফেললো

বাগদাদ নিবাসী শেখ আবু মাসউদ (রহঃ) বর্ণনা করেনঃ আহমদ জামী নামে এক ভন্ড তপস্বী ছিল। সে সাধনা ও যাদু বলে একটি বাঘকে বশীভূত করে তার পিঠে আরোহন করে সর্বত্র বিচরণ করতো। তার হাতে থাকতো একটি বিষধর সাপ— লাঠি স্বরূপ। তার এ অবস্থা দেখে লোকেরা তাকে মহা তাপস বলে ধারণা করতো এবং সম্মান করতো।

উক্ত ভন্ড তাপস বাঘের পিঠে আরোহন করে এক এক দিন এক এক ভক্তের বাড়ীতে গমন করতো এবং বাঘের খোরাক স্বরূপ এক একটি গরু চেয়ে নিত। একদিন সে গাউসে পাকের দরবারের অদূরে একটি বৃক্ষের নীচে বসে তার খাদেমকে পাঠিয়ে দিলো— হযরত বড়পীর সাহেবের নিকট থেকে বাঘের খোরাকের জন্য একটি গরু আনার জন্য।

হযরত বড়পীর সাহেব দিব্য দৃষ্টিতে ভন্ড তাপসের অবস্থা অবলোকন করলেন। তিনি উক্ত খাদেমকে বললেনঃ যাও! আমি একটু পরেই গরু পাঠিয়ে দিচ্ছি। খাদেম গিয়ে এ খবর তার গুরুকে বললো। গুরু গর্বে ফুলে উঠলো। এবার বড়পীর সাহেবের হাদিয়ার পাত্র হতে পারলে তার স্বীকৃতি সর্বব্যাপী হয়ে যাবে।

হযরত বড়পীর সাহেব একটি মোটা তাজা গরু সহ তাঁর খাদেমকে পাঠালেন। হুজুরের পাশেই ছিল পোষা কুকুরটি। কুকুরটিও লেজ উঁচু করে খাদেমের পিছনে পিছনে রওনা দিল। মোটা তাজা গরু দেখে বাঘের জিহ্বায় পানি এসে গেল। বাঘটি হুঙ্কার ছেড়ে যে মাত্র গরুটিকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলো— ঠিক সে মূহুর্তেই হযরত বড়পীর সাহেবের পোষা কুকুরটি এক লাফে বাঘটির উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেললো। শুধু তাই নয়-কুকুরটি উক্ত বাঘটিকে টুক্রো টুক্রো করে খেয়ে ফেললো।

এ অবস্থা দেখে উক্ত ভন্ড তাপস থর থর করে কাঁপতে লাগলো। সে দৌড়িয়ে গিয়ে গাউসে পাকের কদমে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো— "বাবা! ভিক্ষে চাই না। আপনার কুকুরটি সামলান"। হযরত গাউসে পাক তাকে তওবা করালেন। আহমদ জামী তওবা করে খাটি মুরিদ হয়ে গেলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি একজন খাঁটি কামেল ওলীতে পরিণত হয়েছিলেন। হযরত গাউসে পাক কুকুরটিকে কি যেন ইশারা করলেন। সাথে সাথে কুকুরটি বমি করে দিল এবং বমি থেকে বাঘটি পুনরায় জীবিত হয়ে বনে চলে গেল। — (মোজেজায়ে আম্বিয়া ও কারামতে আউলিয়া)।

শিক্ষা ঃ ওলীগণের ছোহ্বতের তাছিরে কুকুরের মধ্যেও অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়। যেমন হয়েছিল আসহাবে কাহাফের কুকুরের মধ্যে এবং খাজা গরীব নওয়াজের জুতা মোবারকের মধ্যে।

একই সময়ে ৭০ জন মুরিদের বাড়ীতে ইফতার

শেখ আবদুল কাদের শামী বর্ণনা করেন ঃ

রমজান মাস। গাউসে পাকের মুরিদগণের প্রত্যেকেরই আশা— একবার হুজুরকে ইফতার করাবেন। ৭০ জন মুরিদ হুজুর গাউসে পাককে একই দিনে ইফতারের জন্য তাদের বাড়ীতে দাওয়াত করলেন। হযরত বড়পীর সাহেব সকলের দাওয়াতই কবুল করলেন। এ অবস্থা দেখে প্রত্যেকেরই মনে প্রশ্ন দেখা দিল— ইফ্তার তো মাত্র একবারই করা যায়। তার পরের বার তো শুধু খানা হয়, ইফতার নয়। অথচ গাউসে পাক ইফতারের দাওয়াত নিয়েছেন। সকলেই দোদূল্যমনে ইফতার তৈয়ার করলেন।

হযরত বড়পীর সাহেব সেদিন আবদালিয়তের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন। অর্থাৎঃ একই সময় বিভিন্ন বাড়ীতে তিনি হাজির হলেন এবং ইফতার করলেন। প্রত্যেকেই ধারণা করলেন— একমাত্র তার বাড়ীতেই হুজুর মেহেরবানী করে তশরীফ এনেছেন এবং ইফতার করেছেন। অন্যের বাড়ী যেতে পারেননি। পরদিন দাওয়াতকারী মুরিদগণ একত্রিত হয়ে তাদের একজন বললেন— হুজুর আমাকে ধন্য করেছেন। অন্যজন বললেন— অসম্ভব! হুজুর তো আমার বাড়ীতে ইফতার করেছেন। এভাবে ৭০ জনই নিজ বাড়ীতে গাউসে পাকের গমন ও ইফতারের দাবী করলেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো— হুজুরের নিজ বাবুর্চি বললেন— না, হুজুর তো নিজ ঘরেই ইফতার করেছেন আমাদেরকে সাথে নিয়ে। এভাবে তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন— গাউসে পাক তো একজন। এত জায়গায় কি করে গেলেন?

তাঁদের কথা শুনে গাউসে পাক বললেনঃ তোমরা ঝগড়া বাদ দাও এবং ঐ গাছটির দিকে তাকাও। সকলে গাছটির দিকে নজর করে দেখেন— গাছের প্রত্যেক পাতায় পাতায় এক একজন গাউসে পাক বসা। হযরত বড়পীর সাহেব বললেনঃ "এখানে যেভাবে, তোমাদের ওখানেও সেভাবেই"। (মোজেজায়ে আম্বিয়া ও কারামতে আউলিয়া)।

(বিঃ দ্রঃ) পাশ্চাত্যের আধুনিক থিউসফী মতবাদেও স্বীকার করা হয়েছে যে, মানব দেহের মধ্যেই চার প্রকারের দেহ বিদ্যমান আছে। যথা ঃ

(১) ফিজিক্যাল বডি।
(২) ইথিক্যাল বডি।
(৩) কস্যাল বডি।
(৪) এস্ট্রাল বডি।

রুহানী শক্তি বিশেষ প্রক্রিয়া ও সাধনার মাধ্যমে ১ম প্রকার ছাড়াও বাকী তিন প্রকার শরীর ধারণ করতে পারে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে। ইসলামী তাসাউফে আব্দালগণ একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দর্শন দিতে পারেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থান

বদল করতে পারেন বলেই তাঁদেরকে আব্দাল বলা হয়। আর এই আব্দালগণ হচ্ছেন ৯ নম্বর স্তরের ওলী। গাউসুল আজম হলেন ১৩ নম্বর স্তরের ওলী। উক্ত কারামতটি ছিল ৯ নম্বর স্তরের অবস্থা। ১৩ নম্বরের অবস্থা কি হতে পারে— তা আল্লাহ-ই জানেন।

১৩ জন খৃষ্টান পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

বাগদাদে অনেক আরবী খৃষ্টান ছিল। একদিন ১৩ জন খৃষ্টান পাদ্রী এসে গাউসুল আজমের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে লিপ্ত হলো। তারা ইছা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্য প্রমাণ করার জন্য বললোঃ আমাদের যিশু মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। কাজেই তিনি খোদার পুত্র। ইসলামের নবীর এমন কোন গুন্ ছিল না (নাউজুবিল্লাহ)। আমাদের নবীই সর্বশ্রেষ্ঠ।

হযরত গাউসুল আজম (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর উপর তাদের মিথ্যা অপবাদ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের যিশু কিভাবে মৃতকে জীবিত করতেনঃ তারা বললোঃ কুম বি-ইজনিল্লাহ্ বলে। হযরত বড়পীর সাহেব বললেনঃ দেখো! নবীগণের সকলকে শ্রদ্ধা করা উচিত। কারও সম্পর্কে হীন ধারনা করা ঈমানের পরিপন্থী। আমরা মুসলমানরা সকল নবীকেই স্বীকার করি এবং শ্রদ্ধা করি। এক একজনকে আল্লাহ এক একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। এটার দ্বারাই তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবীর হাজার হাজার মোজেজা রয়েছে। তিনিও অনেক মৃতকে জীবিত করেছেন। যেমন হযরত যাবেরের দু'ছেলেকে তিনি জীবিত করেছেন। যাক, তর্কের খাতিরে বলতে হচ্ছে— কুম্ বি-ইজ্নিল্লাহ্— অর্থাৎ 'আল্লাহর হুকুমে তুমি জীবিত হয়ে যাও'— বলে তোমাদের পয়গম্বর মৃতকে জীবিত করতে পারতেন বলে তোমরা তাকে খোদার পুত্র বল্ছো। আমাদের প্রিয় নবীর আমি একজন অধম সেবক। আমি মৃতকে কুম্-বি- ইজ্নী অর্থাৎ আমার হুকুমে জীবিত হয়ে যাও- বলেই জীবিত করতে পারি— ইন্শা আল্লাহ। আমাদের নবীর শ্রেষ্ঠত্ব— 'ফলে পরিচয়'। শুধু তাই নয়। আমি নির্দেশ করলে জীবিত ব্যক্তিও মরে যায়। এটা খোদার দান। এই বলে তিনি ১৩ জন খৃষ্টান পাদ্রীকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা আমার নির্দেশে মরে যাও। এ কথা বলার সাথে সাথে তারা ঢলে পড়লো। কিছুক্ষণ পর হযরত বড়পীর সাহেব বললেনঃ আমার হুকুমে তোমরা পুনরায় জীবিত হয়ে যাও। তারা জীবিত হয়ে বললো ঃ আপনিই বড় খোদা। (নাউজু বিল্লাহ)। হযরত গাউসুল আজম বললেনঃ আমি নবীজীর একজন আদ্না গোলাম মাত্র। তোমরা শ্রেষ্ঠত্বের মাপ কাঠী ধরে রেখেছো জীবন মরনের ক্ষমতার মধ্যে। এটা ঠিক নয়। খৃষ্টান পাদ্রীগণ হযরত বড়পীর সাহেবের এই আশ্চর্য কারামত দর্শনে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের দেখাদেখি হাজার হাজার খৃষ্টান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়।

ফানা ফিল্লাহ্তে বিলীন হলে যা চায় তাই মঞ্জুর হয়। তখন খোদা প্রদত্ত শক্তি লাভ করে। হাদীসে কুদ্সিতে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "বান্দা যখন আমার প্রিয়পাত্র হয়ে যায়, তখন আমিই তাঁর দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণশক্তি, ধারন শক্তি ও বাক্শক্তি হয়ে যাই। সে যা চায়-তাই দিই"।— বোখারী শরীফ।

শয়তানের ধোকা থেকে আত্ম রক্ষা

সীরাতে গাউসুল আজম গ্রন্থে হযরত বড়পীর সাহেবের সাহেবজাদা আবু নছর মুছা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) মাতৃগর্ভজাত ওলী হওয়া সত্বেও কঠোর রিয়াজতে মগ্ন থাকতেন। তিনি এশার অজুতে ফজর পড়েছেন প্রায় ৪০ বৎসর। বাবুল আজায মাদ্রাসার দায়িত্ব পালন, হাদীস তাফসীর বয়ান, গ্রন্থ রচনার পাশা-পাশি নীরব ইবাদতে রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। তিনি কোন কোন সময় একাকী চলে যেতেন নীরব বন-জঙ্গলে এবং ধ্যানে মগ্ন হতেন বিশ্ব পালকের উদ্দেশ্যে। একদিন দেখলেন, তাঁর মাথার উপর শূন্যে আলোময় কুরছিতে বসে কে যেন বলছে— হে আবদুল কাদের! আমি তোমার প্রভু। তোমার ইবাদত বন্দেগীতে আমি তুষ্ট। তাই তোমার সাথে দেখা দিলাম। তুমি আমাকে একটি সিজদা করে শুকরিয়া আদায় করো। হযরত গাউসুল আজম বললেনঃ তুমি যে আমার প্রভূ— একথার প্রমাণ কি? আমি তো তোমাকে কোনদিন দেখিনি বা তোমার কথাও শুনিনি যে, দেখেই তোমাকে চিন্‌তে পারবো। আমি আমার প্রিয় নবীর বাণীতে দেখেছি— যেদিন খোদা দেখা দিবেন— তাঁর সাথে রাসূল (দঃ)ও উপস্থিত থাকবেন। কই! আমার নবীজী কোথায়? তুমি যদি সত্যি খোদা হতে, তাহলে রাসূল (দঃ) অবশ্যই সাথে থাকতেন। যার সাথে রাসূল নেই— সে খোদা হতে পারেনা। নিশ্চয়ই তুমি একটা আস্ত শয়তান। লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। একথা বলার সাথে ঐ ছায়া অদৃশ্য হয়ে গেল। ছায়া বললোঃ আবদুল কাদের! তুমি আজ তোমার অসীম জ্ঞানের কারণে আমার ধোঁকা হতে বেঁচে গেলে। হযরত বড়পীর সাহেব বলে উঠলেনঃ না, আমার এলেম আমাকে রক্ষা করেনি— বরং নবী করিম (দঃ)-এর প্রতি আমার প্রেম ও ভালবাসাই আমাকে আজ রক্ষা করেছে। শুধু এলেমই যদি রক্ষা করতে পারতো— তাহলে তোমার অগাধ এলেমই তোমাকে খোদার অভিশাপ থেকে রক্ষা করতো! তোমার এলেম আমল সবই ছিল। ছিল না কেবল আদম নবীর প্রেম। তাই তুমি ধ্বংস হয়েছো। — হযরত বড়পীরের জীবনী

ঐদিন নবী প্রেমই হযরত গাউসুল আজমকে রক্ষা করেছিল। ইসলামী আকিদা মতে খোদা পরিচিতির পূর্ব শর্ত হচ্ছে রিসালাতে বিশ্বাস ও নবী প্রেম। প্রথমে রাসূলকে বিশ্বাস করতে হবে। তারপর তাঁর আনীত সংবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ইহাই ঈমানের মূল সংজ্ঞা। শর্‌হে আকায়েদ দ্রষ্টব্য।

মেয়েকে ছেলে-তে রূপান্তর করা

একদা আবদুল্লাহ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেক্‌কার স্ত্রী হযরত বড়পীর সাহেবের খেদমতে এসে আরজ করলেন— হুজুর! আমাদের ধন দৌলতের কোন অভাব নেই। কিন্তু আমরা নিঃসন্তান। আপনি দোয়া করলে আমি অভাগিনীর মনের আশা পূরণ হতে পারে।

হযরত বড়পীর সাহেবের হৃদয় এই করুণ মাতৃ আবেদনে বিগলিত হয়ে গেল। তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে ছেলে সন্তানের জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর হৃদয়ে ইল্‌হাম হলোঃ হে আবদুল কাদের! উক্ত মহিলার ভাগ্যে কোন সন্তান লিখা হয়নি। ধৈর্য্য ধারণ করতে বলে দাও। হযরত বড়পীর সাহেব পুনরায় দরখাস্ত করলেনঃ পরওয়ারদেগার! তোমার চেয়ে কি তোমার লিখনী বেশী শক্তিশালী? তবে কেন এই মহিলাকে হতাশ করবে? উত্তর আস্‌লোঃ যাও! তোমার খাতিরে এ মহিলাকে একটি পুত্র সন্তান দেবো। তাকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। মহিলা মহাখুশীতে বাড়ী চলে গেলেন। যথাসময়ে তাঁর ঘরে একটি ফুট ফুটে সন্তান ভূমিষ্ট হলো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য; এ যে মেয়ে! কি আর করা যায়!

কিছুদিন পর উক্ত মহিলা কন্যা সন্তানকে কোলে নিয়ে হযরত বড়পীর সাহেবের দরবারে দোয়া নিতে আসলেন এবং বললেনঃ হুজুর! আশা তো আংশিক পূরণ হলো। আপনি তো বলেছিলেনঃ ছেলে হবে। কিন্তু হয়ে গেল মেয়ে।

হযরত গাউসে পাক (রাঃ) কিছুক্ষণ মেয়ে শিশুটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেনঃ না! এটি মেয়ে নয়— ছেলেই। একথা বলার সাথে সাথে মেয়েটির রূপান্তর ঘটতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েলী চিহ্ন মুছে গিয়ে পুরুষালী চিহ্ন ফুটে উঠলো এবং মেয়েটি পূর্ণ ছেলে-তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। হযরত বড়পীর সাহেব নিজেই এ ছেলের নাম রাখলেন শেখ শাহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী। ইনিই কালে সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরিকার ইমাম হয়েছিলেন। গাউসে পাকের দোয়ার বরকতে তিনি ছেলে হয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই— কিন্তু তাঁর বুক দুটি ছিল মেয়েলোকদের মতই উঁচু। এটা গাউসে পাকের কারামতের চিহ্ন ও নিদর্শন ছিল। নবী করিম (দঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু আল্লাহর বান্দা আছে যে, তাঁরা আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তা পূরণ করেন"— মোসলেম শরীফ।

মুন্‌কার-নকীর-এর সাথে বাহাস

"কিতাবুল আছ্‌রার" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ হযরত বড়পীর সাহেব (রাঃ)-এর ইনতিকালের পর দেশ বিদেশের বহু সুফী দরবেশ, অলী-আব্‌দালগণ এসে বাগদাদ শরীফে তাঁর মাজার শরীফ জিয়ারত করতেন।

জনৈক কামেল ওলী একদা হুজুরের মাজার শরীফ জিয়ারত করার পর স্বপ্নে তাঁর দীদার লাভের উদ্দেশ্যে একটি আমল (কাশফুল কুবুর) করে মাজার শরীফের কামরার ভিতরেই শুয়ে পড়লেন। রাত্রে সত্যিই হযরত গাউসে পাকের সাথে স্বপ্নে দেখা হলো। উক্ত অলী সালাম, দোয়া-দরূদের পর জিজ্ঞাসা করলেনঃ কবরে কিভাবে নিষ্কৃতি পেলেন?

হযরত বড়পীর সাহেব হেসে উত্তর দিলেন ঃ আপনার প্রশ্নটা ঠিক হলোনা। বরং জিজ্ঞেস করুন— মুন্‌কার নকীর ফেরেস্তাদ্বয় কিভাবে আমার নিকট থেকে নিষ্কৃতি পেলো!

তবে শুনুন! আমাকে কবরে দাফন করার পর সকলে যখন চলে গেলো, তখন মুন্‌কার নকীর আমার কবরে এসে জিজ্ঞেস করলোঃ বলো— তোমার খোদা কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? আমি প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম— তোমরা কি মুসলমান? তাঁরা বল্‌লো— অবশ্যই। আমি পুনরায় বললামঃ মুসলমানের চিহ্ন কি? সালাম কোথায়? মুসাফাহা কোথায়? সৌজন্যমূলক কুশলাদির কথা কোথায়?

আমার কথায় মুন্‌কার–নকীর অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তাঁরা আমাকে ছালাম দিয়ে যে মাত্র মোসাফাহা করার জন্য হাত বাড়ালো, অমনি আমি তাঁদের হাত চেপে ধরলাম। তাঁদেরকে প্রশ্ন করতে লাগলাম— আচ্ছা! বলতো! আল্লাহ্ যখন আদম সৃষ্টির ইচ্ছা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, তখন তোমরা আদম সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিলে কেন? এটা কি প্রতিহিংসা নয়? ইহা কি আল্লাহ্‌র বিধানে জায়েজ আছে?

আমার প্রশ্ন শুনে ফেরেস্তাদ্বয় হতচকিত হয়ে গেলো। তারা বললো— আমরা তো একা নিষেধ করিনি। সকল ফেরেস্তাইতো নিষেধ করেছিলো। কাজেই তাঁদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ দিন।

আমি একজনকে ছেড়ে দিয়ে অন্যজনকে ধরে রাখলাম। সে গিয়ে অন্যান্য ফেরেস্তাদের সাথে আলোচনা করলো। কিন্তু কেউই এর যথাযথ উত্তর দিতে পারল না। অবশেষে সব ফেরেস্তারা আল্লাহর কাছে আরজ করলো— বারে এলাহী! আমরা তোমার এক বান্দার কাছে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি। তুমি দয়া করে এর উত্তর বলে দাও।

তখন আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে বললেনঃ আমার আবদুল কাদেরের প্রশ্ন সঠিক। মুন্‌কার-নকীরকে বলো— তারা যেন ক্ষমা চেয়ে চলে আসে। আমার যে বান্দা তোমাদেরকে প্রশ্নে আটকিয়ে দিতে পারে— তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করার আদৌ প্রয়োজন আছে কি?

অতঃপর আমি (আবদুল কাদের) মুন্‌কার–নকীরকে এ অঙ্গীকারের উপর ক্ষমা করে দিলাম যে, বাগদাদে বা অন্য কোন স্থানে আমার কোন মুরীদ বা ভক্ত কবরস্থ হলে তাকে তোমরা সরাসরি প্রশ্ন করবেনা। মুন্‌কার নকীর আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমাকে এ আশ্বাস দেওয়ার পর আমি তাদেরকে বিদায় দিলাম। এভাবে মুন্‌কার নকীরই আমার নিকট থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলো।— (মোজেজায়ে আম্বিয়া ও কারামাতে আউলিয়া)।

এ ঘটনাটি যেহেতু স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ মারফত উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সেহেতু এক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন চলে না। এগুলো অলীগণের কারামতের সাথে সংশ্লিষ্ট। কবরে আবু লাহাবের অবস্থা হযরত আব্বাস (রাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে তা বর্ণিত হয়েছে। শাহ আবদুর রহিম দেহলভী (রহঃ) কাশ্‌ফের মাধ্যমে হযরত কুতুবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রহঃ)-এর অনেক ঘটনা উদঘাটন করেছেন। মাওলানা থানবী তার বজ্‌মে জাম্‌শীদ কিতাবে উক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে। অনুরূপভাবে গাউসে পাকের এ ঘটনাটিও কাশ্‌ফের মাধ্যমে প্রাপ্ত। অলী আল্লাহগণের কাশ্‌ফ ও সত্য হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

কৈফিয়ত

অলী-আল্লাহ্‌গণের মধ্যে এক একজন একেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। যেমন হযরত সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)-এর উপাধী ছিল সুলতানুল আরেফীন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-এর উপাধী ছিল সাইয়েদুত তায়েফা। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর উপাধী ছিল মহিউদ্দীন, গাউসুল আজম ইত্যাদি ১১ নাম। হযরত হাসান সাঞ্জারী (রহঃ)-এর উপাধী ছিল মঈনুদ্দীনও খাজা গরীব নওয়াজ-ইত্যাদি। হযরত আলী হিজবেরী (রহঃ)-এর উপাধী ছিল দাতা গঞ্জে বখ্‌শ। হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)-এর উপাধী ছিল মাহবুবে এলাহী। সকল অলীগণ ঐ উপাধী সমূহের সম্মান করতেন এবং নিজেদের নামের সাথে ঐ সব বৈশিষ্টমন্ডিত খাস উপাধীসমূহ ব্যবহার করতেন না। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে খলুসিয়তের মধ্যেও পরিবর্তন হয়েছে। তাই দেখা যায়— ঐ সমস্ত উপাধী কেউ কেউ নিজেদের নামের সাথে যোগ করে দিচ্ছেন। এটা পূর্ববর্তীগণের প্রতি অসম্মান ও অশ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই অধম কারও সমালোচনার উদ্দেশ্যে নয়, বরং হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই "গাউসিয়তে উজমা" সম্পর্কে কিছু তাহ্‌কীক বা অনুসন্ধান মূলক মন্তব্য পাঠকের খেদমতে উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্ পাক আমাকে এবং পাঠক বর্গকে গাউসে পাকের নেগাহে করম নসীব করুন। আমিন।

"গাউসুল আ'জম" পদবীর পদমর্যাদা

"গাউসুল আজম" পদবীটি কি মানুষের, না খোদার-এ নিয়ে ইদানিং বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অর্থের বিনিময়ে কোন কোন নামধারী বিতর্কিত মোফাস্‌সেরে কোরআন বা বক্তা মাহফিলে বলে বেড়াচ্ছেন যে, "যেহেতু গাউসুল আজম শব্দের অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী— সুতরাং এটা মানুষের পদবী হতে পারেনা। বরং কোন মানুষকে গাউসুল আজম বলাও শির্‌ক। আসল গাউসুল আ'জম হচ্ছেন আল্লাহতায়ালা"। বলা বাহুল্য, এরা পীর মাশায়েখ বিরোধী গোত্র। এরা বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) কে গাউসুল আজম বলে মানে না। এরা নজ্‌দের ওহাবী অনুসারী।

তাদের উক্ত আপত্তি এবং দাবীর জবাব হচ্ছে ঃ আল্লাহর ৯৯ সিফাতি নামের মধ্যে গাউসুল আ'জম শব্দ নেই। এমন কি, বিভিন্ন হাদীস ও সিরাত গ্রন্থে আল্লাহর এক হাজার সিফাতি নামের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু উক্ত এক হাজার নামের মধ্যেও গাউসুল আজম শব্দ নেই। এই পদবীটি আল্লাহর নয়। এটি মানব রচিত। মানব রচিত কোন পদবী আল্লাহর শানে হতে পারে না। গাউসুল আ'জম পদবীটি হচ্ছে—

অলী-আল্লাহগণের মধ্যে নির্ধারিত কয়েকজনের জন্যে। অলী-আল্লাহগণের শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পদবী হচ্ছে গাউসুল আ'জম। সুতরাং এই পদবীটি আল্লাহর শানে ব্যবহার করাই অসঙ্গত, বরং কুফরী। এখন দেখা যাক- গাউসুল আ'জম লকব বেলায়াতের কত নম্বরে ও কোন্ স্তরে পড়ে।

বিখ্যাত মোহাদ্দেস হযরত সৈয়দ জামাআত আলী শাহ্ আলী পুরী (রহঃ) মানুষের মধ্যে অলীগণের স্তর এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

১। সাধারণ মানুষের স্তর;
২। ঈমানদারের স্তর;
৩। সাধারণ আউলিয়ায়ে কেরামের স্তর;
৪। শহীদগণের স্তর;
৫। মুত্তাকীগণের স্তর;
৬। মুজতাহিদগণের স্তর;
৭। আবরার অলীগণের স্তর;
৮। আওতাদ শ্রেণীর অলিগণের স্তর- যাদের উসিলায় দুনিয়ার বন্ধন ঠিক থাকে।
৯। আবদাল শ্রেণীর অলীগণের স্তর- যারা এক মুহূর্তে বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হতে পারেন;
১০। কুতুব শ্রেণীর অলিদের স্তর- যারা দিকদর্শনের কাজ করেন;
১১। কুতুবুল আকতাব শ্রেণীর অলীগণের স্তর;
১২। গাউস শ্রেণীর অলীগণের স্তর- যারা মানুষকে সাহায্য করেন;
১৩। গাউসুল আজমের স্তর। (এখানেই অলীগণের স্তর শেষ)।

১৪ নম্বরে তাব্‌য়ে তাবেয়ীন এবং ১৯ নম্বরে সিদ্দিক সাহাবীর স্তর। ২০ নম্বর থেকে নবীগণের স্তর শুরু এবং ২৭ নম্বরে গিয়ে নবী মোস্তফা (দঃ) এর স্তর সমাপ্ত হয়েছে বলে মোহাদ্দেস আলীপুরী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। পাঠকগণের পিপাসা নিবারনের জন্যে শুধু স্তরগুলো নীচে উল্লেখ করছি। ব্যখ্যা করা এখানে সম্ভব নয়।

১৪। তাব্‌য়ে তাবেয়ীন;
১৫। তাবেয়ীন;
১৬। সাহাবী;
১৭। আনসার
১৮। মুহাজির;
১৯। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)
২০। নবীগণের স্তর (আঃ)
২১। রাসূলগণের স্তর (আঃ)
২২। উলুল আজম বা বিশিষ্ট পয়গাম্বরগণের স্তর (৭জন);
২৩। খলিলুল্লাহ; (হযরত ইবরাহীম (আঃ))

২৪। খাতামুন্নাবিয়্যীন— নবী করিম (দঃ);
২৪। রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন (দঃ); ঐ
২৬। হাবিবুল্লাহ (দঃ) ঐ
২৭। মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ঐ
এরপরে আল্লাহর শান আরম্ভ—শানে উলুহিয়াত।

গাউসুল আজম কতজন?

এখন প্রশ্ন হলোঃ অলীগণের সর্বোচ্চ পদবী হলো ১৩নং গাউসুল আজম উপাধী। পৃথিবীতে গাউসুল আজমের সংখ্যা কতজন? এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন জগত বিখ্যাত হানাফী মযহাবের মোহাদ্দেস মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)। তিনি ১০১৪ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি মক্কী। তাঁর কথা দলীল হিসাবে গণ্য।

তাঁর গ্রন্থ নুজ্‌তাহুল খাতিরিল ফাতির ফি তারজিমাতে সাইয়েদীস শরীফ আব্দুল কাদের (রাঃ)-এ উল্লেখ আছে ঃ

بیشک مجھے اکابر سے پہونچا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی
اللہ تعالے عنہ نے جب بخیال فتنہ وبلا یہ خلافت ترک فرمائی اللہ
عز وجل نے اسکے بدلے ان میں اور انکی اولاد امجاد میں غوثیت
عظمی کا مرتبہ رکھا - پہلے قطب اکبر (غوث اعظم) خود حضور
سیدنا امام حسن ہوئے اور اوسط میں صرف حضور سیدنا سید شیخ
عبد القادر اور آخر میں حضرت امام مہدی ہونگے رضی اللہ عنہم
اجمعین (حوالہ : سنی دنیا بریلی شریف از فتاوی اعلی حضرت
رضہ ستمبر ۱۹۹۵—صف ۳۹

অর্থ ঃ "শীর্ষস্থানীয় উলামা ও মাশায়েখগণের মাধ্যমে আমি (মোল্লা আলী ক্বারী) নিশ্চিতভাবে অবগত হয়েছি যে, সাইয়েদুনা ইমাম হাসান মোজ্‌তাবা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু উম্মতের মধ্যে ফেত্‌না ফ্যাসাদের আশংকায় যখন খেলাফত ত্যাগ করলেন, (৬ মাসের মাথায়) এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের মধ্যে এবং তাঁর পবিত্র বংশধরগণের মধ্যে গাউসুল আজম-এর মর্তবা নির্ধারিত করে দিলেন। ফলে প্রথম কুতুবে আকবর (গাউসুল আজম) হলেন স্বয়ং ইমাম হাসান (রাঃ)। আর মধ্যখানে হলেন কেবলমাত্র— হুজুর সাইয়েদুনা সাইয়েদ শেখ আব্দুল কাদের জিলানী এবং শেষ জামানায় হবেন হযরত ইমাম মাহদী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন"। উদ্বৃতি ঃ (মাসিক সুন্নী দুনিয়াঃ বেরেলী শরীফ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ৩৯/সূত্র আলা হযরতের ফতোয়া)

বিশ্লেষণ

উপরোক্ত বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছেঃ

১। আল্লাহ তায়ালা কেবল মাত্র ইমাম হাসান (রাঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই "গাউসিয়াতে উজ্‌মা" বা গাউসুল আজমের মর্যাদা নির্ধারিত করে রেখেছেন।

২। মাত্র তিনজন কুতুবে আকবর বা গাউসুল আজম হবেন। প্রথম জন স্বয়ং ইমাম হাসান (রাঃ), দ্বিতীয় জন মধ্যযুগে কেবলমাত্র— আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এবং তৃতীয় জন হবেন শেষ জমানায় ইমাম মাহ্‌দী (রাঃ)।

৩। গাউসিয়াতে উজ্‌মা বা গাউসুল আজম পদবীকে কুতুবে আকবরও বলা হয়েছে। গাউসুল আজমকে কুতুবে আকবর বলার তাৎপর্য কিছু পরেই পেশ করা হবে।

৪। মধ্যযুগে গাউসুল আজম বা কুতুবে আকবর পদবীতে কেবলমাত্র একজনই ভূষিত হবেন - অন্য কেউ নন। তিনি হলেন-আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) – অন্য কেউ নন। উর্দূ صِرْف শব্দের বাংলা অর্থ ঃ কেবল মাত্র, একমাত্র। সুতরাং মোল্লা আলী কারী এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়ীক শীর্ষস্থানীয় উলামা ও মাশায়েখগণের মতে মধ্যযুগে একমাত্র— গাউসুল আজম হচ্ছেন-হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)। ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত শাহ্‌ আহমদ রেজা খান বেরেলভী (রহঃ) এমর্মেই ফতোয়া লিখেছেন এবং মোল্লা আলী ক্বারীর উক্ত এবারত উদ্বৃত করেছেন।

বিঃদ্রঃ হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর মূল পরিচয় হচ্ছে সাহাবী, বেহেস্তের যুবকদের সর্দার ও পাক পাঞ্জাতনের অন্যতম সদস্য। সাহাবীর মর্তবা গাউসুল আ'জমেরও উর্দ্ধে। তাই গাউসুল আ'জমের মর্যাদা ও মর্তবা প্রাপ্ত হওয়া সত্যেও তিনি সাহাবী এবং রাসুলে পাকের নাতী হিসাবেই সমধিক পরিচিত। যেমনঃ প্রত্যেক নবীই অলি। অর্থাৎ নবুয়তের মধ্যে বেলায়েতও সংযুক্ত। কিন্তু তাঁরা পরিচিতি লাভ করেছেন নবী হিসাবে। তদ্রূপ ইমাম হাসান (রাঃ)-এর মধ্যে গাউসিয়তে উজ্‌মার সিফাত বিদ্যমান থাকা সত্বেও সাহাবী হিসাবেই তিনি পরিচিত। – লেখক।

গাউসুল আ'জম ও কুতুবে আকবর-এর মধ্যে পার্থক্য কি ?

১। কুতুব, কুতুবুল আকতাব, গাউস ও গাউসুল আ'জম- এই চারটি স্তরের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন কোন সময় গাউসকে কুতুব বলেও উল্লেখ করা হয়। যেমন বাহ্‌জাতুল আসরার গ্রন্থের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর ইন্‌তিকালের পর (৫৬১ হিজরী) হযরত আদি বিন হাইতী (রহঃ) কুতুব হয়েছিলেন। তিনি তিন বৎসর পর ইন্‌তিকাল করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন হযরত সাইয়েদ আহ্‌মদ কবীর রেফায়ী (রহঃ)। তিনি ৫৬৪ হিজরী থেকে ৫৭৮ হিজরী পর্য্যন্ত মোট ১৫ বৎসর কুতুব পদে সমাসীন থাকা অবস্থায় ইন্‌তিকাল করেন। এরই মধ্যখানে হযরত খলিল ছারছারী নামে একজনকে হযরত গাউসুল আ'জম কুতুবের পদ দান করেন। তিনি ৭ দিন উক্ত পদে থাকার পর ইন্‌তিকাল করেন।

আসলে উপরের তিন জনই ছিলেন গাউস। কিন্তু বাহ্‌জাতুল আসরারে তাঁদেরকে কুতুব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছেঃ যিনি উপরের আসনে আসীন আছেন, তিনি নীচের পদগুলিও অতিক্রম করে গেছেন। যেমন প্রধান শিক্ষক পূর্বে ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক, এর পূর্বে ছিলেন সহকারী শিক্ষক। সুতরাং প্রধান শিক্ষককে সহকারী প্রধান ও সহকারী বলে উল্লেখ করলেও ভুল হবেনা। কিন্তু নীচের কাউকে উপরের পদে উল্লেখ করা যাবে না। গাউসুল আ'জম কোন সময় গাউসের ভূমিকা পালন করেছেন। কোন সময় কুতুবুল আকতাবের ভূমিকায়, কোন সময় শুধু কুতুবের ভূমিকায়, কোন সময় আবদালের ভূমিকায়ও তিনি কাজ করেছেন। যেমন একই সময়ে তিনি ৭০ জন মুরিদের বাড়িতে ইফতার করেছেন এবং সেখানে একই সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। একাজ হলো ৯নং ক্রমিকের আব্‌দালের ভূমিকা। সুতরাং উপরস্থ কোন অলী নিম্নস্থ পদের কোন কার্য সম্পাদন করলে তাঁকে ঐ সময়ে ঐ নামেই উল্লেখ করা হয় এবং এটা বৈধ।

এ প্রসঙ্গে নক্‌সবন্দীয়া তরিকার একখানা আরবী কিতাব "ইর্‌গামুল মুরিদীন"-এ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

الغوث هوالقطب الذى يستغاث به

অর্থাৎ ঃ "গাউস ঐ কুতুবকে বলা হয়— যার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে ফল পাওয়া যায়।" এখানে গাউসকেও কুতুব বলা হয়েছে। অথচ গাউস হলো কুতুব ও কুতুবুল আকতাবের উপরের পদ। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা (রহঃ) হযরত সাইয়েদ আহমদ কবীর রেফায়ী (রহঃ)-এর পদবী সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে এভাবেই জবাব দিয়ে বলেছেন যে, মূলতঃ তিনি ছিলেন গাউস এবং কুতুবুল আক্‌তাব পর্য্যায়ের

অলী। হযরত গাউসুল আ'জমের পরে তিনি ৫৬৪ হিজরী থেকে ৫৭৮ হিজরী পর্য্যন্ত গাউসিয়তের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। কিন্তু বাহ্জাতুল আসরারে তাঁকে শুধু কুতুব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ কুতুব শব্দ দ্বারা বিশেষ একটি সময়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যখন সাইয়েদ আহমদ রেফায়ী ঐ পদের দায়িত্ব পালনরত ছিলেন। আ'লা হযরত আরও বলেনঃ কুতুব আস্হাবে খেদমতকে অর্থাৎ অন্যের সাহায্য কারীকেও বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেক শহরে, প্রত্যেক সৈন্য বাহিনীতে তাঁরা কাজ করে থাকেন। প্রত্যেক গাউস নিজ যুগের কুতুবুল আকতাব গণের সর্দার বা পরিচালক হয়ে থাকেন। আর কুতুবুল আকতাবগণ অন্যান্য অলী আল্লাহগণের সর্দার। তাই প্রত্যেক গাউসই কুতুবুল আকতাব,এবং গাউসের নীচের সর্দারগণকেই কুতুবুল আক্তাব বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু যে কুতুবুল আক্তাবকে গাউসুল আগ্ওয়াস তথা গাউসুল আ'জম বলা হয় এবং যিনি অন্যান্য গাউস গণকে নিয়োগদান করেন, আর যুগের গাউসগণ তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেন- এমন গাউসুল আ'জম বা কুতুবে আকবর হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর পর একমাত্র মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)। ইমাম মাহ্দী (রাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্য্যন্ত এই মর্যাদা ও উপাধী একমাত্র হযরত আবদুল কাদের জিলানীরই (রাঃ) প্রাপ্য। অন্য কারও নয়। (ফতোয়া আলা হযরত মাসিক সুন্নী দুনিয়াঃ সেপ্টেম্বর '৯৫ সংখ্যা পৃষ্ঠা ২১-২৩)।

এখানেও দেখা যাচ্ছে, ইমাম হাসান (রাঃ) প্রথম গাউসুল আ'জম, ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) দ্বিতীয় গাইসুল আ'জম- অন্য কেউ নন এবং ইমাম মাহদী হবেন শেষ ও তৃতীয় গাউসুল আ'জম। কেউ গাউসুল আজমের দাবীদার হলে কিতাবের প্রমাণের প্রয়োজন। মৌখিক দাবী যথেষ্ঠ নয়।

(দ্রঃ) আরবীতে আ'জম শব্দটি দুভাবে লেখা যায়। প্রথমটি হলো اَعْظَم এবং দ্বিতীয়টি হলো عَجَم । প্রথমটির অর্থ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়টির অর্থ হলো অনারব দেশীয়। অনারব দেশীয় বহু গাউস ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও আসতে পারেন। সুতরাং غَوْثُ الْعَجَم বা আনারব গাউস বলে কেউ দাবী করলে কোন আপত্তি নেই।
غَوْثُ الْاَعْجَم বা সর্বোচ্চ গাউস দাবী করা ঠিক নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

গাউসে পাকের জীবনী ও কারামত সম্পর্কীত মূল কিতাব "বাহ্জাতুল আসরার"-এর লেখক পরিচিতি

হযরত গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী কি কি মর্যাদা লাভ করেছেন? সমস্ত অলীগণের উর্ধ্বে তিনি গাউসুল আজম খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। সমস্ত অলীগণের গ্রীবাদেশে তাঁর কদম স্থান লাভ করেছে। তাঁর অসংখ্য অলৌকিক ক্ষমতা ও কারামত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বাহ্জাতুল আসরার গ্রন্থে। গাউসে পাকের ইন্তিকালের পরে ৬৪৪-৭১৩ হিজরী সনের মধ্যে তাঁর সমস্ত কারামত অতি নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করেছেন ইমাম নূরুদ্দীন আবুল হাসান শাত্নুফী লাখ্মী মিশরী (রহঃ)। তিনি ছিলেন মিশরের বিশ্ব বিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ওস্তাদ ও গ্রেন্ড শেখ। তাঁর গ্রন্থের নাম বাহ্জাতুল আসরার। এ গ্রন্থে গাউসে পাকের বিস্তারিত জীবনী ও কারামত অতি যাচাই বাছাই করে একাধিক বর্ণনাকারীর সূত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

উক্ত কিতাবের নির্ভরযোগ্যতার মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে গ্রন্থকারের কিছু পরিচিতির প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, নির্ভরযোগ্য লেখক না হলে তাঁর গ্রন্থও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। ইসলামে লিখক পরিচিতি নামে ইসলামী শিক্ষার একটি আলাদা শাখা আছে। তাকে বলা হয় 'আসমাউর রিজাল' বা বিষয় বিশেষজ্ঞগণের পরিচিতি ও নামের তালিকা। আমরা বর্তমানে বাছ বিচার ছাড়াই যে কোন ধর্মীয় বই পাঠ করি। লেখকের নির্ভরযোগ্যতা ও আক্বিদা বিশ্বাস সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান করিনা। ফলে ৭২ ফের্কার লেখকের পুস্তকাদিও অসাবধানতায় আমাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। যেমন আজকাল বাতিল পন্থীদের ধর্মীয় বই-পুস্তকে বাজার সয়লাভ হয়ে গেছে। আধুনিক ছাপাখানায় ক্ষণিকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বাতিল ফের্কার বই পেট্রো ডলারের বিনিময়ে ছেপে দেশের আনাচে কানাচে ফ্রি বিতরণ করা হচ্ছে। পূর্ব যুগে একজন লোককে গোমরাহ করতে লাগতো মাসকে মাস। আর বর্তমানে একদিনে গোমরাহ করা যায় লাখ লাখ মানুষকে ফ্রি বই বিতরণের মাধ্যমে।

এবার বাহ্জাতুল আসরার লেখক প্রসঙ্গে আসা যাক। উক্ত কিতাবের লেখক হলেন ইমাম নূরুদ্দীন আবুল হাসান আলী শাত্নুফী মিশরী (রহঃ)। তিনি মিশরের কায়রো শহরের শাতনুফ অঞ্চলে ৬৪৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭১৩ হিজরীতে ১৯শে জিলহজ রোজ শনিবার যোহরের সময় ইন্তিকাল করেন।

বাহ্‌জাতুল আসরার লেখক সম্পর্কে মনিষীদের মতামত

১। ইলমে কিরাতের বিখ্যাত ইমাম শামসুদ্দীন জাজ্‌রী যিনি শাইখুল কোর্‌রা উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। তিনি তাঁর মশ্‌হুর কিতাব 'নেহায়াতুত দিরায়াত ফি আস্‌মায়ে রিজালিল ক্বিরায়াত' গ্রন্থে বলেনঃ আলী ইবনে ইউসুফ ইবনে জারীর ইবনে ফজল ইবনে মি'দাদ নূরুদ্দীন আবুল হাসান লাখমী শাতনুফী শাফেয়ী ওস্তাদে মোহাক্কেক। যাঁর উচ্চ গুণাগুণ ও মর্যাদার কারণে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতো এবং যিনি ছিলেন সমগ্র মিশরে যুগের শ্রেষ্ঠতম শেখ। তিনি ৬৪৪ হিজরীতে কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মসনদে সমাসীন হন। তাঁর সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য শিক্ষার্থীর ভিড় জমে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ফেকাল্টিতে। শামসুদ্দীন জাজরী বলেনঃ ইল্‌মে ক্বিরাতের বিখ্যাত গ্রন্থ শাত্‌রিয়া-এর উপর ইমাম নূরুদ্দীন একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

২। বাহ্‌জাতুল আস্‌রার গ্রন্থের লেখক ইমাম নূরুদ্দীন আবুল হাসান (রহঃ) সম্পর্কে রিজাল সাস্ত্রের ইমাম শামসুদ্দীন জাহাবী "তাবাকাতুল মুক্বরিয়ীন" গ্রন্থে বলেন ঃ

"আলী ইবনে ইউসুফ লাখ্‌মী শাত্‌নুফী (আবুল হাসান নূরুদ্দীন) ছিলেন যুগের একক ইমাম, কোরআন মজিদের ইলমে ক্বেরাতের ওস্তাদ, মিশরের ক্বারীগণের মধ্যে শাইখুল ক্বোর্‌রা। তাঁর উপনাম আবুল হাসান। মূল বাসিন্দা সিরিয়ার। কিন্তু জন্মগ্রহণ করেন কায়রোতে ৬৪৪ হিজরীতে। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শেখ হিসেবে তিনি শিক্ষাদান করতেন। আমি (ইমাম জাহাবী) তাঁর শিক্ষাদানের মজলিসে উপস্থিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছি।"

৩। ইমাম জাহাবীর শাগরেদ ইমাম তাজুদ্দীন সুবুকী ইবনে ইমাম তক্বিউদ্দীন সুবুকী বলেন ঃ

"আমার ওস্তাদ ইমাম জাহাবী ছিলেন মাতুরিদী পন্থী আকায়েদের ইমাম। আর বাহজাতুল আসরার গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান ছিলেন আশ্‌আরী পন্থী। উভয়ে সমকালীন দুই মতবাদের ইমাম ছিলেন। দুই মতবাদের কারণে ইমাম আবুল হাসানের প্রতি আমার ওস্তাদ ইমাম জাহাবীর বিরূপ মনোভাবাপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও তিনি বাহ্‌জাতুল আস্‌রারের লেখক ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন শাত্‌নুফীকে আল-ইমামুল আওহাদ" অর্থাৎ যুগের একক শ্রেষ্ঠ ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই দুটি শব্দ দ্বারা তিনি ইমাম আবুল হাসানের বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও উচ্চমর্যাদার পরিমাপ করেছেন।" (তাবাকাতুল মুক্বরিয়ীন)।

বাহ্‌জাতুল আসরার (আরবী) কিতাব পরিচিতি ও মূল্যায়ন

বাহ্‌জাতুল আস্‌রার শরীফের লেখক ও সংকলক হলেন ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইবনে ইউসুফ শাতনুফী লাখমী মিশরী (রহঃ) যা পূর্বেই বর্ণনা করা

হয়েছে। ৫৬১ হিজরীতে গাউসুল আজমের (রাঃ) ইন্‌তিকালের ৮৪ বৎসর পর ৬৪৪ হিজরীতে তাঁর জন্ম এবং ৭১৩ হিজরীতে তাঁর ইন্‌তিকাল। প্রায় ৭০ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে তিনি গাউসুল আজমের জীবন কাহিনী ও কারামত বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর হাদীস গ্রন্থ 'মোয়াত্তা' এবং ইমাম বোখারী (রহঃ) এর বোখারী শরীফের অনুকরণে বর্ণনাকারী রাবীগণের নাম ও সনদসহ একাধিক সূত্রে বাহ্‌জাতুল আস্‌রার কিতাবখানা গ্রন্থনা করেন। হাদীস গ্রন্থের অনুকরণে সনদসহ লেখার কারণে উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখীনে ইজামগণের নিকট বাহ্‌জাতুল আস্‌রার কিতাবখানা অতি পবিত্র ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। বাহ্‌জাতুল আস্‌রার গ্রন্থখানা সম্পর্কে বিভিন্ন মোহাদ্দেসীনে কেরামগণের মন্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। যথা ঃ

১। ইমাম শামসুদ্দীন জাহাবী বলেন ঃ

ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন গাউসুল আজমের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। হযরত গাউসুল আজমের জীবনী ও কামালাত তিন খন্ডে সংগ্রহ করে নাম রেখেছেন বাহ্‌জাতুল আস্‌রার।

২। শাইখুল কোররা শামসুদ্দীন জাজরী বলেন ঃ

"এই গ্রন্থখানা কায়রোতে হযরত সালাহ্‌ উদ্দীন (রহঃ)-এর খান্‌কায় সংরক্ষিত আছে। আমাদের ওস্তাদ হাফেজুল হাদীস মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের হানাফী এবং অন্যান্য ওস্তাদগণ উক্ত গ্রন্থের রেওয়ায়াতকৃত ঘটনাবলী বর্ণনা করার অনুমতি আমাকে দিয়েছেন।"

৩। ইমাম ওমর ইবনে আব্দুল ওহাব ফরজী হলবী 'বাহ্‌জাতুল আস্‌রার' গ্রন্থের পান্ডুলিপি থেকে অনুলিপি লিখে তাতে লিখেছেন ঃ

"আমি (ওমর ইবনে আব্দুল ওহাব) বাহ্‌জাতুল আস্‌রার শরীফ আদ্যোপান্ত যাচাই করে দেখেছি যে, এতে এমন কোন বর্ণনা নেই যা বিভিন্ন বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেননি। বরং একাধিক সূত্রে উক্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। বাহ্‌জাতুল আস্‌রার গ্রন্থ থেকে ইমাম ইয়াফেয়ী আস্‌নাল মাফাখির, নাশ্‌রুল মাহাসিন ও রওজুর রাইয়াহীন গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনা উদ্বৃত করেছেন। অনুরূপভাবে শামসুদ্দীন জাকী হলবীও কিতাবুল আশ্‌রাফ গ্রন্থে বাহ্‌জাতুল আস্‌রারের রেওয়ায়াত উদ্বৃত করেছেন।"

৪। ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'বাহ্‌জাতুল আস্‌রার' এর খোতবায় লিখেছেন ঃ

لخصته كتابا مفردا مرفوع الاسانيد معتمدا فيها على الصحة دون الشذوذ -

অর্থ ঃ "আমি উহাকে নজিরবিহীন কিতাব আকারে সাজিয়েছি। এর বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা শেষ মাথা পর্যন্ত (গাউসুল আজম) পৌছিয়েছি- যার মধ্যখান থেকে কেউ বাদ পড়েননি। আর বর্ণনাকারীগণের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর জোর দিয়েছি, যাতে অপ্রসিদ্ধ কোন বর্ণনা ঢুকতে না পারে। অর্থাৎ আমার কিতাবে খাঁটী সহিহ্ ও মশহুর রেওয়ায়াতসমূহ সন্নিবেশিত করেছি। এতে কোন দুর্বল, গরীব ও অপ্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত নেই।"

৫। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) 'হোস্নুল মোহাদারাহ ফি আখ্বারে মিশর ওয়াল ক্বাহেরা' গ্রন্থে লিখেছেন

"আলী ইবনে ইউসুফ ইবনে জরীর লাখ্মী শাত্নুফী যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন। তাঁর উপাধী নূরুদ্দীন এবং কুনিয়াত আবুল হাসান। তিনি মিশরের শাইখুল কোর্রা ছিলেন। ৬৪৪ হিজরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জামেউল আজহারে অধ্যাপনার আসন অলংকৃত করেছেন। শিক্ষার্থীদের ভীড় তাঁর দরস্গাহে উপ্চে পড়তো। তিনি ৭১৩ হিজরীর জিলহজ মাসে ইন্তিকাল করেন।"

৬। শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) 'সালাতুল আস্রার' গ্রন্থে বলেন

"সম্মানীত কিতাব 'বাহ্জাতুল আস্রার' হচ্ছে নূরের খনি, নির্ভরযোগ্য, সর্বজন স্বীকৃত, সর্বমহলে প্রসিদ্ধ ও আলোচিত। এই গ্রন্থের প্রণেতা (আবুল হাসান নূরুদ্দীন) হচ্ছেন জগত বিখ্যাত উলামাগণের একজন। তাঁর কিতাবখানার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, লেখক এবং গাউসুল আজম রাদিআল্লাহু আন্হুর মধ্যখানে বর্ণনাকারীর সংখ্যা মাত্র দু'জন।"

৭। ইমাম আহমদ রেজা ফাজেলে বেরেলভী (রহঃ) বলেন

"সম্মানীত ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন (রহঃ)-এর 'বাহ্জাতুল আস্রার' গ্রন্থখানায় বর্ণিত প্রতিটি রেওয়ায়াত এত নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণ হলোঃ রেওয়ায়াতকারীগণের সংখ্যা তাঁর উপরে মাত্র দু'জন। তার পরেই হযরত গাউসুল আজম (রহঃ)। যেমন ঃ ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীনের ওস্তাদ ছিলেন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইমাম হাফেজ তকিউদ্দীন আন্মাতি, তাঁর ওস্তাদ ইমাম মুয়াফফাক উদ্দীন ইবনে কুদামা মাক্দাসী, তাঁর ওস্তাদ ও পীর ছিলেন হযরত গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)। এমনিভাবে সনদের আর একটি সূত্র হচ্ছেঃ ইমাম কাজী উল কোজাত মুহাম্মদ ইবনে ইমাম ইবরাহীম ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ মাকূদাসী, তাঁর ওস্তাদ ইমাম আবুল কাশেম হিবাতুল্লাহ ইবনে মনসুর, তাঁর পীর হযরত গাউসুল আজম (রহঃ)। এমনিভাবে সনদের আর একটি সূত্র হচ্ছেঃ ইমাম সফিউদ্দিন খলীল ইবনে আবু বকর মারায়ী, তাঁর ওস্তাদ ইমাম আবু নসর মুসা, তাঁর ওস্তাদ ও পীর আপন পিতা হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)। এভাবে প্রত্যেকটি ঘটনার

বর্ণনাকারীর সংখ্যা মধ্যখানে মাত্র দু'জন। কিতাবের বর্ণনাকারী রাবীগণের সংখ্যা যত কম হবে, নির্ভরযোগ্যতা তত বেশী হবে।

তিনি অন্যত্র বলেনঃ 'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থ প্রণেতা আবুল হাসান নূরুদ্দীন (রহঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন ইমাম ও মোহাদ্দেস গণের অভিমত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের মতে ইমাম আবুল হাসান যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ও ইমাম, বিশ্লেষন ধর্মী আলেম, ফকীহ, শাইখুল ক্বোররা, প্রসিদ্ধ অলী-আল্লাহ ছিলেন। তাঁর রচিত কিতাব "বাহ্জাতুল আস্রার" নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। উক্ত গ্রন্থ হতে পরবর্তী শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও উলামাগণ উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং সনদ হিসাবে উক্ত গ্রন্থ মেনে নিয়েছেন। উলামাগণ হাদীস গ্রন্থের ন্যায় উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা ও রেওয়ায়াত করার জন্যে দস্তুরমত ওস্তাদ থেকে অনুমতি নিতেন।

অন্যান্য কিতাবের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়ঃ ইমাম মালেকের হাদীস গ্রন্থ "মোয়াত্তা" শরীফ উচ্চ সনদের ক্ষেত্রে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ হতে যেমন অনেক উর্দ্ধে, তেমনি ভাবে হযরত গাউসুল আজমের জীবনী গ্রন্থ সমূহের মধ্যেও "বাহ্জাতুল আস্রার" উচ্চ সনদের ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়।

বোখারী শরীফের সনদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা কারীগণের বিশুদ্ধতার উপরই বেশী গুরুত্ব দিতেন। তেমনিভাবে অলি-আল্লাহগণের জীবনী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'বাহ্জাতুল আস্রার' গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন (রহঃ) বর্ণনাকারীগণের বিশুদ্ধতার উপরই কেবল জোর দিতেন না বরং অপ্রসিদ্ধ বা সাজ কোন বর্ণনাও তাঁর কিতাবে স্থান দেননি। অন্যান্য সহিহ্ হাদীস গ্রন্থে অপ্রসিদ্ধ বা সাজ বর্ণনা ও সন্নিবেশিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) শুধু রাবীর বিশুদ্ধতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন, কিন্তু ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন (রহঃ) বিশুদ্ধ বর্ণনা গ্রহণ ও অপ্রসিদ্ধ বর্ণনা বর্জন- উভয়টির উপরই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ইমাম ওমর হলবীর সাক্ষ্য মতে আবুল হাসান নূরুদ্দীনের সতর্কতা ইমাম বুখারীর চেয়েও পরিপূর্ণ। ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীনের প্রতিটি বর্ণনা একাধিক সূত্রে বর্ণিত। সুতরাং বিশ্বস্ততা ও বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নির্ভুল ও অধিক নির্ভরযোগ্য।" (ফতোয়া রেজভিয়া ও সুন্নী দুনিয়াঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সংখ্যা)

৮। ইমাম আবুদল্লাহ ইবনে আস্আদ ইয়াফেয়ী (রহঃ) "মিরআতুল জিনান" গ্রন্থে মন্তব্য করেন

"হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর কারামাতের সংখ্যা বেশুমার ও গণনার বাইরে। তন্মধ্যে কিছু কারামাত আমার লিখিত 'নশ্রুল মাহাসিন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। আমি যতজন শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও উলামা পেয়েছি, সবার মুখেই একথা শুনেছি যে, গাউসুল আজমের কারামাতগুলোর সত্যতা হাদীসে মোতাওয়াতেরের

ন্যায় সত্য ও নির্ভুল। পৃথিবীর অন্য কোন অলী-আল্লাহ হতে গাউসুল আজমের মত এত কারামত প্রকাশ হয়নি। উক্ত কারামাতসমূহ নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইবনে ইউসুফ ইবনে জারীর ইবনে মি'দাদ শাফেয়ী লাখ্‌মী আপন কিতাব 'বাহ্‌জাতুল আসরার' শরীফে লিপিবদ্ধ করেছেন।"

নুজহাতুল খাতির ও ফাতাওয়া হাদিসিয়া গ্রন্থদ্বয়

হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর আর একখানা জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)। তিনি মক্কা শরীফের বাসিন্দা। মেশকাত শরীফের শরাহ মিরক্বাত তাঁরই লিখিত। তিনি হানাফী মাজহাবের একজন শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেস। তিনি ১০১৪ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) ও শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) তাঁর সমসাময়ীক ছিলেন। তখন ভারতে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল ছিল। মোল্লা আলী কারী (রহঃ)-এর গ্রন্থের নাম 'নুজ্‌হাতুল খাতিরিল ফাতির-ফি তারজিমাতে সাইয়েদীশ শরীফ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)। এই গ্রন্থ খানার নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। গাউসে পাকের আর একখানা জীবনী গ্রন্থ ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী লিখেছেন। নাম দিয়েছেন ফাতাওয়া হাদিসিয়া। তাঁর ইন্‌তিকাল হয়েছে ৯৭৪হিজরীতে। কিতাবের নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

বিঃ দ্রঃ - অধম লেখক রচিত গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস গ্রন্থখানি পাঠ করুন। এতে পাবেন— গেয়ারভী শরীফ কি ও কেন ? গেয়ারভী শরীফ পাঠ করার নিয়ম, কাসিদায়ে গাউসিয়া শরীফের ফজিলত ও আরবীসহ কাব্যানুবাদ ও সরল অর্থ এবং খতমে গাউসিয়া শরীফ পাঠ করার নিয়ম ও ফজিলত।